শ্রীজীবনকৃষ্ণ

বোলপুর পাঠচক্রের নিবেদন

বোলপুর, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ

প্রকাশক ঃ
শ্রী শ্রীধর ঘোষ
চারুপল্লী, বোলপুর, বীরভূম, পিন - ৭৩১ ২০৪
দূরভাষ (০৩৪৬৩) ২৫৫ ৩৭৬

প্রথম প্রকাশ ঃ
৭ই জৈষ্ঠ, ১৪০৮ (২১শে মে, ২০০১)
দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১১ (২১শে মে, ২০০৪)
তৃতীয় সংস্করণ ঃ
৭ই জৈষ্ঠ, ১৪১৮ (২২শে মে, ২০১১)

(প্রকাশক কর্তৃক সর্বসত্ত্ব সংরক্ষিত)

কম্পিউটারে বর্ণসংস্থাপনে ঃ
শঙ্কর প্রসাদ দাস
১৭/১/৩৭, বিধাননগর রোড
কলকাতা ৭০০ ০৬৭

মুদ্রণে ঃ
গ্যালাক্সি প্রিন্টার্স
৭/১, গুরুদাস দত্ত গার্ডেন লেন
কলকাতা ৭০০ ০৬৭

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা ঃ
একজন মানুষ সূর্যমন্ডলস্থ পুরুষ অর্থাৎ ব্রহ্ম হন— তাঁর ব্রহ্মত্ব তাঁরই চিন্ময় রূপ ধরে বহু মানুষের সহস্রারে (জলাশয়ে) ফুটে ওঠে। বহুত্বে একত্ব স্থাপিত হয়।

প্রচ্ছদ চিত্রায়ণ ও অলংকরণে ঃ
শ্রীজয়কৃষ্ণ চ্যাটার্জী, জামবুনি, বোলপুর, বীরভূম।

মূল্য ঃ ২০্ টাকা মাত্র

—ঃ তথ্য উৎস ঃ—
হাওড়া থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক 'মাণিক্য' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যা থেকে বেশিরভাগ তথ্য সংগৃহীত হয়েছে।

নিবেদন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের লেখায় মনুষ্যজাতির অন্তরে লালিত বহু যুগের এক আকাঙ্খা স্পষ্ট রূপ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন—

'এই কল্লোলের মাঝে নিয়ে এসো কেহ
পরিপূর্ণ একটি জীবন
নীরবে মিটিয়া যাবে সকল সন্দেহ
থেমে যাবে সহস্র বচন।'

এরূপ একটি জীবনের যেন দেখা মিলল শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ সত্যই এক অনন্য পুরুষ। আত্মিক ও ব্যবহারিক জীবনের সমন্বয়ে তাঁর পরিপূর্ণ (Perfect) জীবনটি সমগ্র মনুষ্যজাতির কাছে আদর্শ। আদর্শ কথার এক অর্থ দর্পণ। দর্পণে নিজের প্রতিবিম্ব দেখা যায়। সেইরূপ আদর্শ জীবনের প্রেক্ষাপটে নিজের সত্য পরিচয়টি তথা অপূর্ণতা স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। তখন পূর্ণতা অর্জনের পথে কর্তব্যকর্ম নিরূপণ সহজ হয়। সকল কালে, জীবনের সকল ক্ষেত্রে, কর্তব্যের ঈঙ্গিত দান করতে ও জীবন সত্যকে ধরিয়ে দিতে পারেন যে মানুষ তিনিই প্রকৃত অর্থে আদর্শ মানুষ। স্থূলদেহের অবসানের পরও শ্রীজীবনকৃষ্ণ অসংখ্য মানুষের অন্তরে স্বপ্নে, ধ্যানে ও জাগ্রত অবস্থায় চিন্ময় রূপে ফুটে উঠে ব্যবহারিক জীবনে নিত্যনূতন সমস্যার সমাধান নির্দেশ করেন, আবার অন্তরের জ্যোতির্ময় লোকে উত্তীর্ণ করে তাদের নিজেদের মহত্তম সত্তার পরিচয় প্রদান করেন। নানা মতের সংঘাতে নানা পথের গোলক ধাঁধায় দিশাহারা মানুষ অকূলে কূল পায়— তারা জানতে পারে, যত মত তত পথ-এর প্রকৃত অর্থ— এক মত এক পথ। মানুষের দেহে ভগবান, তিনি কৃপা করে প্রকাশ পান— এই হল মত আর পথ হল, দেহের নিম্নভূমি মূলাধার থেকে সহস্রার। অন্তর্মুখী প্রাণচৈতন্যের এই পথ পরিক্রমা শেষে ধরার মানুষই ব্রহ্মত্ব লাভ করে। অতঃপর সেই ব্রহ্মত্ব জগৎব্যাপ্ত হয়— তাঁর জৈবী দেহের চিন্ময় রূপে সংখ্যাতীত মানুষের অন্তরে। মানুষের আত্মিক জীবনের এই বিস্ময়কর পরিণতি বিশ্বাসের কথা নয়, ভক্তির কথা নয়, এ এক বাস্তব ঘটনা যার প্রমাণ দেয় মানুষ তথা জগৎ, অন্তরের দর্শন সাপেক্ষে।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর কল্পিত পূর্ণপুরুষকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন—

'তোমার চরণে আসি মাগিবে মরণ
লক্ষ্যহারা শত শত মত
যেদিকে ফিরাবে তুমি দুখানি নয়ন
সেদিকে হেরিবে সবে পথ।'

আমরা দেখছি হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইত্যাদি সব সম্প্রদায়ের মানুষের দেহমধ্যে চিন্ময়রূপে ফুটে উঠছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। অযুত কণ্ঠে ধ্বনিত হচ্ছে 'তত্ত্বমসি'— তুমিই সেই আকাঙ্খিত পুরুষ। তাঁকে অন্তরে পেয়ে মানুষ উপলব্ধি করতে পারছে যে তারা বাইরে বহু কিন্তু অন্তরে এক। আর এই আত্মিক একত্বই ধর্মের চরম লক্ষ্য।

আত্মিক একত্ব স্থাপনের এই কারিগরের কাছে কবির সুরে সুর মিলিয়ে আমরাও প্রার্থনা জানাই—

'তোমার সৌন্দর্যে হোক মানব সুন্দর
প্রেমে তব বিশ্ব হোক আলো
তোমারে হেরিয়া যেন মুগুধ অন্তর
মানুষে মানুষ বাসে ভাল।'

শ্রীজীবনকৃষ্ণ এমন এক মহাপথিক, জীবনপথে যাঁর প্রতি পদক্ষেপে মুক্তির সংকেত উঠেছে ফুটে। তাই সে মহাজীবন সকলেরই অনুধ্যেয়।

এই মহামানবের ব্যবহারিক ও আত্মিক জীবন সঠিকভাবে তুলে ধরার সামর্থ্য নেই আমাদের। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত রচয়িতা শ্রীম বলেছেন— 'কারও জীবনী মানে কতকগুলো ঘটনা পরপর সাজানো নয়, জীবনী হল কোন মানুষের মন ও আত্মার ক্রমবিকাশের কাহিনী।' তাঁর এই বক্তব্য স্মরণে রেখে শ্রীজীবনকৃষ্ণের অতি সংক্ষিপ্ত একটি জীবনী এখানে প্রকাশ করা হল।

বোলপুর পাঠচক্রের আশ্রিতগণ
৭ই জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৮

মহাজীবন

শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের দেহাবসানের প্রায় চোদ্দ বছর পর ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৮ই এপ্রিল আমেরিকার সানফ্রান্সিসকো শহরে স্বামী বিবেকানন্দ এক বক্তৃতায় বলেছিলেন— 'মহাপুরুষের অভ্যুদয়ের শুভ সময় সমাগত। তিনি ধর্মের অ-আ-ক-খ ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সৃষ্টি করবেন সুস্পষ্ট ও শক্তিশালী সত্যকার ধর্ম তথা আত্মার দ্বারা আত্মার পূজা (The hour comes when great men shall arise and cast off these kindergartens of religions and shall make vivid and powerful the true religion, the worship of the spirit by the spirit– Swami Vivekananda, complete works, Vol–VIII)।'

গৌরবোজ্জ্বল জীবনের শেষ অধ্যায়ে স্বামী বিবেকানন্দ জ্ঞান ও সাধনার প্রভাবে ধর্ম সম্বন্ধে নূতন ধারণার আলোকে তাঁর মানস নয়নে কি প্রত্যক্ষ করেছিলেন আর এক মহামানবের অভ্যুদয়ের আভাস?

ধীরে ধীরে ধর্ম জগতে নূতন ঊষার অরুণোদয় হয়েছে, আবির্ভাব ঘটেছে নূতন প্রাণপুরুষের— শ্রীজীবনকৃষ্ণের।

১৩০০ বঙ্গাব্দের ৭ই জ্যৈষ্ঠের পূণ্য প্রভাতে মা অন্নপূর্ণার কোল আলো করে পিতা সুরেন্দ্রনাথের মুখে হাসি ফুটিয়ে মাতামহের কর্মস্থল হাওড়া জেলার আমতায় জন্ম নিলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। জন্মের পর অঝোর ধারায় বৃষ্টি নেমে এল। এ যেন মনুষ্যজাতির উপর ঈশ্বরের কৃপাবারি বরিষণ। জন্মের আট দিনের মাথায় মূষলধারে বৃষ্টির দাপটে শিশুর দল আসতে পেল না আটকড়ায়ের অনুষ্ঠানে। মাতামহের আটজন বৃদ্ধ বন্ধু কুলো বাজিয়ে সেই সংস্কারজ অনুষ্ঠান সাঙ্গ করলেন। পুরাতনের সাথে পুরাতন জীর্ণ সংস্কার বিদায়ের পালা হল শুরু।

মায়ের সূতিকা জ্বর হওয়ায় আঁতুড় ঘর থেকেই হ'ল মায়ের সঙ্গে ছাড়াছাড়ি। মাত্র আড়াই মাস পর মাতৃদেবী ইহলোক ত্যাগ করলেন একমাত্র শিশু সন্তানকে চিরদিনের জন্য মাতৃস্নেহ থেকে বঞ্চিত করে। এই সময়

মাসিমায়েরও একটি কন্যা সন্তান হয়ে মারা যায়, তারই স্তনপানে শিশুর প্রাণরক্ষা হয়। এ যেন ঠিক দেবকীর গর্ভে কৃষ্ণ জন্মলাভ করে নন্দগৃহে যশোদার কাছে লালিত পালিত হল। পরে পিতাকেও হারান মাত্র ৭/৮ বছর বয়সে। দৈবের কি বিচিত্র পরিহাস! জগতের নাথ যিনি তিনি হলেন অনাথ, পিতৃমাতৃহারা, জীবনের প্রারম্ভেই।

তাঁর ঠাকুরদাকে (নিত্যধন ঘোষ) লোকে মুন্সীগঞ্জের (খিদিরপুরের) রাজা বলত। বাড়ীতে চাকর দারোয়ান মিলিয়ে কাজের লোক ছিল প্রায় এগারো জন। কিন্তু সেই বিলাসের পরিবেশ থেকে সরে এসে দৈব ইচ্ছায় শিশু মানুষ হতে লাগল দাদু-দিদিমার কাছে। কলকাতার খিদিরপুরের মনসাতলায়, পরে গড়পারে*। দাদু প্যারীমোহন সরকার ছিলেন সাব-রেজিষ্ট্রার। পিতা সুরেন্দ্রনাথ ঘোষ ছিলেন পরম ভক্ত মানুষ। ভোর বেলা ঘুম থেকে উঠে বাইরের বারান্দায় বসে থাকতেন। পথ দিয়ে একজন ব্রাহ্মণ যাবে, তার পায়ের ধূলো কলাপাতায় নিয়ে কলাপাতাসুদ্ধ খেয়ে তবে ঘরে ঢুকবেন— এই রকম প্রকৃতির ছিলেন। মাতৃকুলও ছিল গাঢ় ভক্তিরসে জারিত। দিদিমা সারারাত ধরে পুজোর যোগাড় করে সকাল হতেই কালীঘাটে যেতেন। মা কালীর পুজো দিয়ে বেলা বারোটার পর বাড়ী ফিরতেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের তখন তিন থেকে সাড়ে তিন বছর বয়স। আমতায় আছেন। একদিন মধ্যরাত্রে ঘুম ভেঙে গেছে। দিদিমাকে খুঁজতে খাটের শেষপ্রান্তে এসে দেখেন দিদিমা পুজো করছেন। সামনের দিকে চোখ ফেরাতে অবাক বিস্ময়ে দেখলেন, জীবন্ত মাকালী খাঁড়া হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। ভয়ঙ্করী সেই কালীমূর্তি দেখে ভয়ে চিৎকার করে উঠলেন "ও দিদিমা গো, তোমার মা কালী আমায় কাটতে আসছে গো"— বলে। ছুটে এসে দিদিমা তাকে জড়িয়ে ধরলেন। তখন থেকে দিদিমা কালীপুজো ছাড়লেন, পাছে তার নাতির কোন অনিষ্ট হয় সেই আশঙ্কায়। বস্তুত এই বিচিত্র দর্শনে দিদিমায়ের কালীপুজো উঠে গেল, শিশু জীবনকৃষ্ণ পেল সংস্কার মুক্ত পরিবেশ।

*সিক্সথ ক্লাস থেকে থার্ড ইয়ার পর্যন্ত।

যখন তাঁর বয়স চার, খিদিরপুরে মাতামহের কাছে আছেন, এক দিন দুপুরে ঘুম ভেঙে গেছে। স্থূলে দর্শন হল সম্পূর্ণ অপরিচিতা সাদা কাপড় পরিহিতা এক বিধবা মহিলা— পিঠে এলো চুল— ধীরে ধীরে তাদের পুরনো পরিত্যক্ত রান্নাঘরে ঢুকে গেলেন। পরবর্তীকালে বুঝেছেন পরাবিদ্যা* মূর্তিমতী হয়ে তাঁকে দর্শন দিয়েছেন ওই শিশুকালে। ঠাকুর বললেন, 'কলিতে বেদমত চলে না।' কিন্তু ফেলে আসা প্রাচীন বৈদিক সাধন কথিত পরাবিদ্যা নতুন করে জেগে উঠল তাঁর দেহে। শুরু হ'ল সত্য যুগ।

এগারো বছর বয়সে তিনি একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়লেন। প্যারাটাইফয়েড হয়েছিল। সন্ধ্যার সময়, ঘরে তখন কেউ ছিল না, একটি অপরিচিতা নারী এসে তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। দ্বিতীয় দিনেও ঠিক ঐ সময়ে সেই মহিলাটি যখন তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিচ্ছেন (একদিন বাঁদিক থেকে, অপরদিন ডান দিক থেকে) তখন শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, তুমি কে গা? মহিলাটি উত্তর দিলেন, আমি শীতলা। এই দর্শনের তাৎপর্য প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলেছেন, আদ্যাশক্তি ঐ রূপে এসে রিপুনিচয়ের তেজ খর্ব করে দেহটিকে শীতল করে দিলেন।

শীতলা পূজার যথার্থ অর্থ পরিস্ফুট হল। শীতলার বাহন ভারবাহী গাধা। শ্রীজীবনকৃষ্ণ হয়ে উঠলেন মহাসত্যের ধারক ও বাহক। তাই তিনি পরবর্তীকালে রসিকতা করে বলতেন, বৈকুণ্ঠে বিষ্টু ঠাকুরের একদিন মনে পড়ল তার বাবার একটা গাধা আছে। তখন আর কি! সেই গাধার খোঁজে বেরোলেন। খুঁজতে খুঁজতে গড়পারে গিয়ে দেখেন এই তো বাবার সেই গাধা। সেই যে বারো বছর চার মাস বয়সে গাধার পিঠে চেপে বসলেন এখনও পর্যন্ত তার আর নিস্তার নেই।

এই ১২ বছর ৪ মাস বয়সে এক রাত্রে বালক জীবনকৃষ্ণকে একজন অজানা মানুষ স্বপ্নে দেখা দিয়ে শিক্ষা দিতে লাগলেন। পরপর দু'রাত্রি দেখা দিলেন তিনি।

---

*বিদ্যা দুরকম— পরা ও অপরা। পরাবিদ্যা হল ব্রহ্মবিদ্যা। মূর্তিমতী পরাবিদ্যাই প্রতীকে শ্বেতাম্বরা সরস্বতী।

পরে মাঝে মাঝেই দেখা দিতে থাকেন, কথা কন, কোলে করেন কাঁধে চড়ান। শ্রীজীবনকৃষ্ণ সমস্তই দেখতেন, আনন্দ হত এই পর্যন্ত। কাউকে এসব কথা বলতেন না। পনের বছর বয়সে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃতের রচয়িতা শ্রীম'র মর্টন স্কুলে ভর্তি হলেন। সেখানে মাস্টার মশায়ের ক্লাসে কথামৃত গ্রন্থে ঠাকুরের ছবি দেখে বুঝেছিলেন ঐ যে অজানা মানুষটি মাঝে মাঝে তাকে দেখা দেন, শিক্ষা দেন তিনি আর কেউ নন স্বয়ং শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। ১৩ বছর ৮ মাস বয়সে দেখলেন স্বামী বিবেকানন্দকে। সারারাত ধরে শিয়রে বসে তিনি শিক্ষা দিলেন। মাথার মধ্যে একটি ধ্বনি ও লেখা ফুটে উঠল— 'রাজযোগ'। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, জ্ঞানযোগ কঠিন অর্থাৎ হয় না। কর্মযোগ সম্পর্কে বললেন, নিষ্কাম কর্ম হয় না। ঈশ্বর দর্শন হলে তবে মানুষ নিষ্কাম হয়। অর্থাৎ কর্মযোগের মাধ্যমে ঈশ্বর দর্শন হয় না। ভক্তিযোগই যুগধর্ম। অর্থাৎ শরণাগতি— কৃচ্ছ্র সাধন নয়। ভগবানের জন্য ব্যাকুল হয়ে কান্না। পরবর্তীকালে বুঝলেন ভক্তিযোগ সহজ নয়— 'লোকে মাগ-ছেলের জন্য ঘটি ঘটি কাঁদে কিন্তু ঈশ্বরের জন্য কে কাঁদছে বলো দেখি?' তাই ঠাকুর শেষে বললেন, রাজযোগই ভাল। শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে জেগে উঠল— রাজযোগ— যোগের রাজা— যা আপনা হতে দেহেতে প্রকাশ পেয়ে দেহীকে আত্মিকে রাজা অর্থাৎ ভগবানে পরিবর্তিত করে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, স্বপ্নে যদি আমাকে ধর্ম উপদেশ দিতে দ্যাখ, জানবে সে আমি নই, সে সচ্চিদানন্দ। শ্রীরামকৃষ্ণের রূপে সচ্চিদানন্দগুরুর আবির্ভাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহ যোগযুক্ত হ'ল। কুণ্ডলিনী বা মহাবায়ু জাগ্রত হ'ল। বেদমতে আমাদের দেহেতে পাঁচটি কোষ— অন্নময়, প্রাণময়, মনোময়, বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় কোষ। এই পাঁচটি কোষের মধ্যে আছে সাতটি ভূমি। লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ, ভ্রূ এবং সহস্রার। সাধারণতঃ দেবমন্দিরে যেমন সাতটি সিঁড়ি অতিক্রম করে প্রতিমা দর্শন করতে হয়— আমাদের এই দেহ মন্দিরেও সাতটি ভূমি অতিক্রম করে সহস্রারে শ্রীভগবান দর্শন হয়। অন্নময় কোষ হচ্ছে আমাদের এই স্থূল দেহ যা অন্নগ্রহণে পরিপুষ্ট হয়। সাধারণ মানুষের মন এই অন্নময় কোষেই আবদ্ধ থাকে। সচ্চিদানন্দগুরুর

কৃপায় মন অন্তর্মুখী হলে ধীরে ধীরে অপর কোষগুলির আবরণ উন্মুক্ত হয়। অন্নময় কোষ থেকে মন আসে প্রাণময় কোষে। এই কোষে রয়েছে প্রথম তিনটি ভূমি— লিঙ্গ, গুহ্য, নাভি। শ্রীজীবনকৃষ্ণের প্রাণময় কোষে দর্শন হ'ল— পেটের দক্ষিণ দিকে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নায় বিজড়িত হয়ে স্বচ্ছ নীলাভ জল কলকল করছে। ঠাকুর বলেছেন— আলেখলতার জল পেটে পড়লে গাছ হয়। এ সেই জল। দেহটিকে লতার মত আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে যে নির্গুণ ব্রহ্ম তিনি প্রসন্ন হলে প্রথমে তলপেটের ডানদিকে প্রতীকে জলরূপে দেখা দেন। সাধনবৃক্ষের বিকাশ শুরু হয়। এ কোষ মুক্ত হ'ল। মন এল মনোময় কোষে— চতুর্থভূমি হৃদয়ে। এই ভূমিতে মন অবস্থান করার সময় একদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণ দেখলেন— যেদিকে তাকাচ্ছেন সেইদিকই জ্যোতির্ময়। চোখ পড়ল একটি গাছের ডালে, দেখছেন সেই ডালটি যেন পারা অথবা গলানো রূপোর মত জ্যোতির্ময় হয়ে আছে। শ্রীরামকৃষ্ণদেবের জীবনেও এই রকম অনুভূতির কথা পাওয়া যায়। একদিন তিনি কালীঘরে পূজা করছেন। দেখছেন— কোষাকুষি, বেদী, মার্বেল পাথরের মেঝে, চৌকাঠ, সব চিন্ময় জ্যোর্তিময়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ এই দর্শনের রহস্য ভেদ করে বলেছেন— তাঁর অন্তরে উদ্ভুত আত্মিক জ্যোতি চক্ষু হতে প্রতিফলিত হওয়ায় তিনি চারিদিক জ্যোর্তিময় দেখছেন অর্থাৎ নিজের চৈতন্যে জগৎ চৈতন্যময় দেখছেন।

এবার বিজ্ঞানময় কোষে মনের উত্তরণ। এখানে তিনভূমি— পঞ্চমভূমি অর্থাৎ কণ্ঠ, ষষ্ঠভূমি অর্থাৎ ভ্রূমধ্য এবং সপ্তমভূমির কিয়দংশ শিরোদেশ। কণ্ঠদেশে মনের অবস্থানকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণের এক বিচিত্র দর্শন হয়। একদিন দুপুর বেলায়, চারিদিকে সূর্যের আলো, উনি হতবাক হয়ে দেখলেন, নিজের অর্ধনারীশ্বর মূর্তি। উপরার্ধে তিনি পুরুষ। নিম্নাঙ্গে তিনি নারী। এই দর্শনে তিনি উপলব্ধি করলেন যে আত্মার লিঙ্গভেদ নেই। তিনি পুরুষও বটে নারীও বটে। এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণ এক মজার কাহিনী শুনিয়েছেন। এক গৃহস্বামী বাড়িতে কালীপূজার আয়োজন করেছেন। তার এক প্রতিবেশী প্রতিমা দর্শন করতে এসে দেখেন যে প্রতিমার গলায় পৈতে পরানো। তখন তিনি গৃহস্বামীকে প্রশ্ন করলেন, ভাই তুমি একী করেছ? মায়ের গলায় পৈতে

পরিয়েছ! গৃহস্বামী বললেন, ভাই তুমিই ঠিক চিনেছ! আমি এখনও জানি না মা আমার পুরুষ না নারী।

এরপর মন পঞ্চমভূমি ছেড়ে উঠে এল ষষ্ঠভূমিতে। এই ভূমিতেই উন্মীলিত হল তৃতীয় নেত্র বা জ্ঞানচক্ষু। একে উপনয়নও বলে। দুটি চক্ষু হতে দুটি পৃথক জ্যোতির গোলক বেরিয়ে ভ্রূমধ্যে এসে এক হয়ে গেল। আর এই জ্যোতির গোলকের মধ্যে দেখা গেল বুদ্ধমূর্তি। বুদ্ধ জ্ঞানের প্রতীক। এই জ্ঞানচক্ষু উদ্ভাসিত না হলে সহস্রারে শ্রীভগবানকে দেখা যায় না ও ঈশ্বরীয় দর্শন সমূহের মর্মভেদ করা যায় না। এরপর হ'ল মায়ামূর্তি দর্শন। দিনদুপুরে খোলা চোখে নৃত্যপরা রহস্যময়ী মায়ামুর্তি দর্শন। এই নারীমূর্তির গায়ের রঙ স্নিগ্ধ ঘাসফুলের রঙ। বসন ফিকে নীলাম্বরী। নাসায় নীল পাথরের বেশর। দৃষ্টি ভূমিতে আনত ও আবদ্ধ। তিনি ভ্রূমধ্যে হাতের বুড়ো আঙুল ঠেকিয়ে নৃত্যপরা, নৃত্যধীর। আনন্দ যেন তার সর্বাঙ্গ দিয়ে উচ্ছলিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। আনত ও আবদ্ধ দৃষ্টিতে বুঝিয়ে দিলেন— মায়া রহস্যময়ী। অনুভূতির দ্বারা মায়ার রহস্য ভেদ হয়। মায়া কৃপা করে ষষ্ঠভূমি থেকে সপ্তমভূমি যাবার দ্বার খুলে দিলে তবে সপ্তমভূমিতে প্রবেশ ও ব্রহ্মজ্ঞান।

মন এল সপ্তমভূমিতে। শ্রীজীবনকৃষ্ণের বয়স তখন ২৪ বছর ৮ মাস। অটুট ব্রহ্মচর্যে বীর্যবান তাঁর সবল সুগঠিত দেহে ঘটল সুদুর্লভ ভগবান দর্শনের অনুভূতি। তিনি দেখলেন— অবর্ণনীয় জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ জ্যোতির যেন এক সমুদ্র। উদ্ভাসিত জ্যোতিপুঞ্জের এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন তাঁর সচ্চিদানন্দগুরু শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এই পরমজ্যোতির সমুদ্রে নীল রেখার দ্বারা সীমায়িত বুড়ো আঙুল আকৃতির ঘন জ্যোতিকে আঙুল দেখিয়ে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলে বুঝিয়ে দিলেন— এই ভগবান, 'এই ভগবান দর্শন।' তারপর তিনি সেই জ্যোতির মধ্যে লীন হয়ে গেলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, কেউ এসে বলবে 'এই—, এই—' তবে জানবি ঠিক ঠিক। এ সেই দর্শন। ঠিক ঠিক— যোলআনা। এরপর আত্মা দেখতে দেখতে হয়ে গেল ধুমকেতুর লেজের মত— ধান্যশীর্ষবৎও বলা যায়— ধানের শীষ গোছা করে ধরলে

যেমন দেখায় ঠিক তেমনি। তাও মিলিয়ে গেল— দ্রষ্টার জৈবীসম্বিৎ ফিরে এল।

এর অনেক পরে ঠাকুর দেখা দিয়ে বলেছিলেন, দ্যাখ তোকে যদি কেউ ভগবান দর্শনের কথা জিজ্ঞাসা করে তাহলে বলিস ঠাকুর কৃপা করে আমায় ভগবান দর্শন করিয়ে দিয়েছেন। পাছে উত্তরকালে এই দর্শনের জন্য তাঁর মনে কোন অহংকার জাগে তাই কৃপাময় সচ্চিদানন্দগুরু তাঁকে শিক্ষা দিলেন— ভগবানের কৃপায় ভগবান দর্শন, তোমার চেষ্টায় নয়।

এরপরের অধ্যায় বেদান্তের সাধন— সম্পূর্ণ হতে সময় লেগেছিল বার বছর চার মাস। প্রথমে ব্রহ্মজ্ঞানের ফুট কেটে দুটি উপলব্ধি হ'ল। প্রথম, তিন কাল নেই আছে এককাল— চিরন্তন বর্তমান। হবে আর কোথায়, হয়েই আছে। উনি যে জাহাজে বিলেত যাবেন সেটি আগেই স্বপ্নে দেখলেন। কত নম্বর কেবিনে যাবেন তাও দেখলেন। বিলেতের পথঘাটও দেখলেন। পরে তা হুবহু মিলে গেল। একবার গ্রীষ্মকালে একটা গাছের নীচে একটু দাঁড়িয়েছেন, হঠাৎ মনে পড়ল আরে গতরাত্রে স্বপ্নে দেখেছি ঠিক এই গাছের নীচে এসে দাঁড়িয়েছি। এইরকম অজস্র অনুভূতি হ'ত। দ্বিতীয় উপলব্ধি— জগৎ আমার ভেতরে। গোটা কলকাতা শহর নিজের ভিতর দেখলেন। পরে নিঃসংশয় হলেন ভিতরে দেখা জগৎ ও বাইরের জগৎ এক। শেষে বিশ্বরূপ দর্শন হ'ল। বোধোদয় হ'ল জগৎ আমার ভেতরে। এত বড় জগৎ কী করে আমার ভেতর ধরল? একটা খুঁত খুঁত ভাব আসে। এবার 'বিশ্ববীজবৎ' অনুভূতি হ'ল। দেহের মধ্যে আত্মা। আত্মার মধ্যে জগৎ বীজরূপে, অণু রূপে বিধৃত। পরে বীজও থাকল না, জগৎ স্বপ্নবৎ অনুভূতি হ'ল— স্বপ্ন আর ব্যবহারিক জগৎ একাকার হয়ে গেল। পরে স্থিত সমাধিতে বোধাতীত অবস্থায় প্রাণচৈতন্য লয় হ'ল। যখন তার বোধ ফিরে এল তখন মনে হ'ল আমি তো ছিলাম না। তবে কে? হে ভগবান তুমি, তুমি। এই 'তুমি' কর্তা জ্ঞান বা তত্ত্বজ্ঞান হ'ল তাঁর।

এই সময় একদিন সকাল বেলা। তাঁর ঘরে তখন কেউ ছিল না।

তিনি হতবাক হয়ে দেখলেন— তার দেহ হতে এক সজীব সালংকার পার্থসারথি মূর্তি বেরিয়ে তাঁর উরুদেশে বসলো। বিস্মিত নেত্রে তিনি তাকিয়ে রইলেন সেই মূর্তির দিকে। কিছুক্ষণ পর সেই জীবন্ত মূর্তি আবার তাঁর দেহের ভিতর ঢুকে গেল। তিনি নিঃসংশয় হলেন যে যাবতীয় আধ্যাত্মিক দর্শন অনুভূতির উৎস হ'ল এই দেহ। দেহের ভিতরে থেকে শ্রীভগবান দেহরথ চালনা করছেন।

এবার শুরু হ'ল অবতারতত্ত্বের সাধন। দেহে চৈতন্য উদ্ভূত হল। সহস্রারে লাল আলোর শিখা দেখলেন। যেখানে অনেকে চৈতন বা টিকি রাখে। এবার জ্যোতিরূপে এই চৈতন্যের অবতরণ ঘটল। প্রথম বার সহস্রার থেকে কণ্ঠদেশ পর্যন্ত হ'ল এই অবতরণ। দ্বিতীয় বার অবতরণ ঘটল সহস্রার থেকে কটিদেশ পর্যন্ত। এই হ'ল প্রকৃত ঈশ্বরকটিত্বের অনুভূতি। এই চৈতন্য মানুষ রতনের রূপ পরিগ্রহ করল। ছোট্ট দেহী 'মানুষরতন' হলেন পরম ভক্ত। তার সারা কপাল জুড়ে চন্দনের ফোঁটা। বর বিয়ে করতে যাবার সময় যেমন পরে। তিনি হাততালি দিয়ে হরিনাম করছেন আর সেই সঙ্গে জীবনকৃষ্ণের হাতের তালু কিরকির করছে। ভক্তশ্রেষ্ঠরূপে অবতীর্ণ চৈতন্যকে অর্থাৎ মানুষরতনকে দর্শন করে শ্রীজীবনকৃষ্ণের অবতারত্বে অধিষ্ঠান ঘটল।

উপলব্ধির আলোয় শ্রীজীবনকৃষ্ণ অবতারত্বের রহস্য উন্মোচন করেছেন। কিন্তু কোথাও থেমে দাঁড়াননি। তিনি ছিলেন ধর্মজগতে প্রগতির প্রতীক। এরপর অজস্র অনুভূতি হয়ে অবতারত্ব অতিক্রম করে সর্বজনীন সর্বকালীন মানব হয়ে উঠেছেন তিনি।

এ প্রসঙ্গে যাবার আগে ওঁনার ব্যবহারিক জীবনের দিকে একটু দৃষ্টি ফেরানো যাক্।

ছোট থেকেই তিনি একটু ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। ছেলেরা তাকে এত সৎ ও নিরপেক্ষ বলে জানত যে নিজেদের মধ্যে কোন ঝামেলা হলে তাঁর কাছে আসত বিচার চাইতে। কোন বিশেষ পক্ষ অবলম্বন করে খেলাধূলা করায় তাঁর আগ্রহ ছিল না। তবে সকলের অনুরোধে কোন কোনোদিন

বুড়িচু খেলায় বুড়ি হতে সম্মত হতেন। তাতে ছেলেদের খেলার উৎসাহ দ্বিগুণ বেড়ে যেত। বড় হয়ে যখন মঠে যাতায়াত শুরু হল, সেখানেও দেখলেন দুটো দল। একদল ভাবত উনি ওদের দলে। অপর দল ভাবত উনি বুঝি তাদের দলে। উনি মনে মনে বলতেন, ঠাকুর, আমি কোন দলের নই আমি তোমার, তুমি আমায় তোমার করে নাও। দল যদি থাকে তো আমি তোমার দলে।

এগারো/বারো বছর বয়সে লিভারে দোষ হওয়ায় খুব রোগা হয়ে পড়েছিলেন। তাই পরে ভর্তি হলেন বিষ্ণু ঘোষের আখড়ায়। শুরু করলেন ব্যায়াম। সুগঠিত মজবুত দেহ হল। যখন প্যারালাল বার করতেন লোক দাঁড়িয়ে যেত দেখবার জন্য। তিনি বুঝেছিলেন শরীরচর্চা করা দরকার। বেদেও আছে, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'। তাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা ব্যায়াম করতেন। একদিন একজন ওনার ব্যায়াম করা দেখে বলে উঠলেন, আপনি তো বেশ ব্যায়াম করেন। আপনার কুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়েছে। উনি বললেন, 'আপনি ধরতে পেরেছেন! তাহলে বলি শুনুন। আমি এক্সারসাইজ করি, কুণ্ডলিনী জাগ্রত হলে যে ঝাঁকুনী হয় তাকে কন্ট্রোল (নিয়ন্ত্রণ) করার জন্য। কিন্তু তা হয় না।' একবার পিকক (ময়ূরাসন) করতে করতে হাত ফসকে পড়ে গিয়ে ওনার মাথায় চোট লাগল। আশ্চর্য, তখন থেকে আপনা হতে শরীরের ওপর অনেকটা কন্ট্রোল এল।

খেতেও পারতেন খুব। কোন বাছবিচার ছিল না। তবে বাজারের সেরা জিনিসটি ছিল তাঁর পছন্দ। মাছ মাংস সবই খেতেন। বহু পরে প্রৌঢ়ত্বে উত্তরণের পর একদিন স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব বললেন, এত গরম জিনিস খাস কেন? তখন থেকে মাছ মাংস খাওয়া খুব কমিয়ে দিয়েছিলেন।

শিশুকাল থেকেই তাঁর ছিল অপরিগ্রহ। তিনি তখন স্কুলের ছাত্র। পড়েন খিদিরপুর একাডেমিতে, কাপড় পড়ে স্কুলে যেতে হত। টিফিনের জন্য এক পয়সা বেঁধে দেওয়া থাকত কাপড়ের খুঁটে। তিনি কাপড়ে গিট বাঁধতে পারতেন না। স্কুলে যেদিন কাপড় খুলে যেত বন্ধুদের কাউকে তিনি

বেঁধে দিতে বলতেন। তাকে সেদিন নিজের টিফিনের পয়সাটুকু দিয়ে দিতেন। কারও কাছ থেকে কোন প্রকার সেবা নিতে পারতেন না, টাকা পয়সা তো দূরের কথা।

গ্রীষ্মের অসহ্য গরমেও কোন অনুরাগী যদি কৌশলে নিজেকে বাতাস করার অছিলায় তাঁকে পাখার হাওয়া করার চেষ্টা করেছেন কখনও, অমনি হাতজোড় করে বলতেন, আমার কষ্ট হয় বাবা, তুমি নিজে হাওয়া নাও, আমাকে দিতে হবে না। পরক্ষণে বলতেন— ওরে, মানুষের সেবা নিলে ভগবানের সেবা পাওয়া যায় না। কথামৃতে গল্প করে ঠাকুরও সেকথা বলেছেন।

বাড়ির বৌমা সকলের খুব সেবা যত্ন করে। একদিন শাশুড়ি বললেন— বৌমা, তোমার যদি কেউ পা টিপে দেয় তাহলে বেশ হয়। তখন বৌমা শাশুড়িকে উত্তর দিলে, না মা, আমার পা কাউকে টিপে দিতে হবে না, আমার পা হরি টিপবেন।

একদিন একজনের দেশলাইয়ের একটা কাঠি নিয়ে কান খুঁটছেন, অমনি শ্রীরামকৃষ্ণ স্থূলে দেখা দিয়ে বললেন, অন্যের জিনিস নিয়েছিস কেন? এক্ষুণি ফিরিয়ে দে। তৎক্ষণাৎ তাকে কাঠিটি ফিরিয়ে দিয়ে বললেন— ওরে বাবা, ঠাকুর খুব কড়া লোক রে, এটুকুও নিতে দেবে না।

তিনি ছিলেন পিতামাতার একমাত্র সন্তান। উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর প্রাপ্য সম্পত্তির কোন কিছু গ্রহণ করেন নি। একবার তাঁর ছোট কাকীমার কাছ থেকে একজন একটি চিঠি নিয়ে এসে হাজির। কাকীমার কাছে তার অংশের অনেক জিনিসপত্র নাকি রয়েছে। তিনি গ্রাহ্য করলেন না। লোকটি চলে গেলে তিনি সেই চিঠি ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। এ বিষয়ে মাসীমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'জানো না গো, বিষয়ে যে বিষ আছে'।

বহু পরে, ১৯৬৬ সালে ব্যাতাইতলার ঘরে একজন ৩২০০ টাকা নিয়ে ওনাকে দিতে এসেছিলেন। ওনার প্রাপ্য সম্পত্তির সামান্য কোন অংশের পরিবর্তে দাম হিসাবে কিছু দেবার জন্য। উনি শোনামাত্র চিৎকার করে

উঠলেন, বললেন,— 'মেনো, ওকে তাড়িয়ে দে, ওকে তাড়িয়ে দে'। ওনার চেঁচামেচিতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হল যে লোকটি চলে যেতে বাধ্য হল। অথচ তিনি তখন অসুস্থ এবং আর্থিক সঙ্কটের মুখোমুখি হয়েছেন।

এমনি অসংখ্য অপরিগ্রহের উজ্জ্বল উদাহরণ ছড়িয়ে আছে তাঁর সমগ্র জীবনে।

তিনি শ্রীম'র মর্টন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন থার্ডক্লাসে অর্থাৎ অষ্টম শ্রেণীতে। সেখানে কথামৃতের ক্লাস নিতেন শ্রীম নিজে। তিনি বালক জীবনকৃষ্ণকে কথামৃত পড়ে তা বোঝাতে বলতেন। বালকের দেওয়া অপূর্ব ব্যাখ্যা বাকী ছাত্রদের সঙ্গে তিনি নিজেও মুগ্ধ হয়ে শুনতেন। এই কথামৃত পাঠই ছিল তাঁর সাধনা। ছুটির দিনে আট-দশ ঘণ্টা কথামৃত পড়েও যেন তাঁর আশ মিটত না।

ঠাকুরের নামে তাঁর এত ভালবাসা জন্মেছিল যে একসময় মনে হয়েছিল ঠাকুরের নাম কি কপালে ফুটে উঠতে পারে না, লোকে যা দেখে ঠাকুরের নামের মাহাত্ম্য বুঝবে, তাদের চৈতন্য হবে। বকবক করে ঠাকুরের কথা বলে তাদের চৈতন্য জাগ্রত করতে হবে না। রামকৃষ্ণ নাম ফুটল বটে তবে কপালে নয়, পিঠে। লাল দগদগে হয়ে। তিন দিন ছিল, তারপর দেহেতে মিলিয়ে গেল।

রোজ শোবার সময় ভাবতেন ঠাকুর আসবেন আর তাঁর কাঁধে চড়ে সারা কলকাতা বেড়িয়ে বেড়াবেন। তখন দাদুর পাশে শুতেন। একদিন খুব ভোরে ঘুম ভেঙে গেছে। দেখেন, কে একজন বসে। ভাবলেন, ঠাকুর এসেছেন, আর যায় কোথা— ছুটে গিয়ে কোমর জড়িয়ে ধরলেন। তারপর 'ছাড় ছাড়, ওরে আমি রে আমি'— শুনে সে ভাবটা গেল। দেখেন ঠাকুর নয়, দাদুর কোমর জড়িয়ে ধরেছেন।

মাস্টার মশায়ের স্কুলে পড়ার সময়েই শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহে রাগানুগা ভক্তির চিহ্ন ফুটে উঠত। সারা দেহের প্রতি লোমকূপের গোড়া লাল হয়ে ঘামাচির মত ফুলে উঠত। লোকে দেখে বলতো, বাবা! যেন একটা রক্তের

চাঁই যাচ্ছে। ঈশ্বরে অনুরাগের অর্থ প্রকাশ পেল জগতে। অনুরাগ মানে অণুতে অণুতে, প্রতি লোমকূপে, রাগ অর্থাৎ রঞ্জিত হয়ে ওঠা। এর জন্য কৃত্রিম আবীরের আবশ্যক হয় না।

মহাপ্রভুর অন্ত্যলীলায় দিব্যোন্মাদ অবস্থায় একবার এরূপ যোগৈশ্বর্যের প্রকাশ হয়েছিল বলে চৈতন্যচরিতামৃতে উল্লেখ আছে।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ অতিরিক্ত সুপারী খেতেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পুঁথিতে বর্ণিত ঠাকুরের সুপারী খাওয়া নিষিদ্ধ হওয়ার ঘটনা পড়ে ভাবলেন, বাবা, তাহলে সাধুর সুপারী খাওয়া নিষেধ, এমনকি ঠাকুরেরও! কিন্তু তবুও তিনি আগের মতই সুপারী খেতে লাগলেন। একদিন গেল, দুদিন গেল, তিনদিনের দিন লিভারের উপরে পেটে সুপারীর মত ফুলে উঠল ও যন্ত্রণা হতে লাগল। সুপারী ফেলে দিলে আর যন্ত্রণা থাকল না। পরে একদিন একই ঘটনা ঘটল। তখন থেকে সুপারী খাওয়া বন্ধ হল।

শ্রীরামকৃষ্ণগতপ্রাণ শ্রীজীবনকৃষ্ণের মানসিক অবস্থা একসময় এই রকম হয়েছিল যে তিনি সর্বক্ষণ ঠাকুর ঠাকুর করে দিন কাটাতে চেয়েছিলেন। তিনি ভাবলেন দুবেলা খাওয়ার জন্য আধসের আটা কি তাঁকে জগৎ দেবে না? এই সময় একদিন তাঁর একটি বিশিষ্ট অনুভূতি হ'ল। দেখলেন— জগৎ দুভাগ হয়ে গেল। একদিকে জগতের ঘরবাড়ি গাছপালা সবকিছু, অপরদিকে উনি আর ঠাকুর*। ঠাকুর ওনার হাত ধরে নাচছেন আর বলছেন "খাটবি খাবি, খাটবি খাবি।" বুঝলেন, গুটি কয়েক ভক্ত জুটিয়ে তাদের পয়সায় খাওয়া নয়। সৎপথে খেটে খেয়ে ভগবান ভগবান করতে হবে। বিচিত্রগামী জীবনের অধিকারী শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে এই সৎপথে খেটে খাওয়ার বৈশিষ্ট্য বিস্ময়কর ও দৃষ্টান্তস্বরূপ।

*ঠাকুরকে দেখেছিলেন পঞ্চানন নামে একজনের রূপে। পঞ্চানন মানে শিব। ওনারই জগৎব্যাপ্ত শিবচৈতন্য। জগতের যে অংশে উনি আর ঠাকুর সেদিকে আর কিছু নেই, তার কারণ সেদিকে সৃষ্টি হবে নতুন জগৎ (আধ্যাত্মিক জগৎ) যা আজ পর্যন্ত হয়নি।

স্বোপার্জিত অর্থেই তিনি জীবন কাটিয়েছেন, টিউশন করেছেন। বি.এ. পর্যন্ত পড়ে এক বছরের জন্য হাওড়া জেলার আমতার কাছে নারিটে মহেশ ন্যায়রত্ন ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতা করেছেন। থাকতেন বোর্ডিং-এ। দরদী শিক্ষক হিসাবে ছাত্রদের খুব প্রিয় হয়ে উঠলেন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শেষে মিলিটারী দপ্তরে চাকরী নিয়ে প্রথমে পারস্যে (ইরানে) পরে বেলুচিস্তানের কোয়েটায় (বর্তমান পাকিস্তানে) কিছুকাল কাজ করেন। পরে মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমান ইরাক) বসরাতে হেড অ্যাকাউন্ট্যান্ট পদে উন্নীত হলেন। সেখান থেকে বাগদাদ সচিবালয়ে ডেপুটেড হন ও সেখানে কিছুকাল কাজ করে (যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠনের কাজে) বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। এই সাফল্যের স্বীকৃতি হিসাবে মেসোপটেমিয়ার সিভিল কমিশনার লেফ্‌টেন্যান্ট কর্নেল এ.টি. উইলসন সাহেব ১৯২০ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ভারত সরকারকে এক তারবার্তায় শ্রীজীবনকৃষ্ণের নেতৃত্বাধীন ভারতীয় দলটির কাজকর্মের চরম সুখ্যাতি করেছিলেন এবং অনুরোধ করেছিলেন সেই প্রশস্তিপত্র যেন ভারতের আইনসভায় (পার্লামেন্টে) পড়া হয়। বলাবাহুল্য তার সে অনুরোধ রাখা হয়েছিল।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর উপার্জিত অর্থ নিয়মিত পাঠাতেন মাসীমাকে। তারই কিছু অংশ সঞ্চয় করে মাসীমা তাঁর হাতে তুলে দিলে সেই টাকায় তিনি বিলাত গেলেন স্যানীটরী ইঞ্জিনীয়ারিং পড়তে। বৎসরাধিক কাল বিলাতে অধ্যয়ণ করে দেশে ফিরলেন ১৯২২ সালে।

বিলাতে ওনার রুমমেট এস. বি. সিনহা, যিনি পরে কলকাতা হাইকোর্টের জজ্ হয়েছিলেন, রসিকতা করে বলতেন, তুমি এখানে এসেছ স্যানিটেশন (Sanitation) শিখতে! ওরা স্যানিটেশনের কী শেখাবে? যারা কখনও জলশৌচ করে না তারা স্যানিটেশনের জানে কী?

একদিন লণ্ডনে পিকাডেলী সার্কাসে বসে খাচ্ছেন। সঙ্গে আছেন জাস্টিস্ সিন্‌হা। খেতে খেতে নাম করছিলেন আর ভাব হচ্ছিল। তখন তাকে বললেন, দেখ, এখানে এই পরিবেশ, এখানেও দেহে সাত্ত্বিক লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

বিলেতে যাদের সঙ্গে থাকতেন তারা প্রত্যেকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জুয়েল ছিল। এমন কয়েকজন ছিল যারা জীবনে কখনও সেকেণ্ড হয়নি। এরকম ব্রিলিয়াণ্ট স্কলাররা পর্যন্ত তাঁর সাথে তর্ক করতে সাহস পেত না। তাঁর কাছে পরামর্শ চাইত। যা বলতেন একেবারে মেনে নিত। তারা ওনার নাম দিয়েছিল ম্যরালিস্ট (নৈতিক উপদেষ্টা)।

তিনি ইতিহাস পড়তে খুব ভালবাসতেন, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে বিচার করে পড়তেন। ইংল্যাণ্ডে থাকতে ব্রিটিশ মিউজিয়ামেও খুব করে প্রাচীন ইতিহাস পড়েছেন। পরবর্তীকালে কথা প্রসঙ্গে ইতিহাসের নানা বিষয়ে নতুন কথা বলে সকলকে চম্‌কে দিতেন। পরক্ষণে ঈশ্বরপ্রসঙ্গে ডুবে যেতেন। একবার বললেন, ‘‘আচ্ছা বলদিকি আলেকজান্ডার ও পুরুর মধ্যে যে যুদ্ধ হ’ল তাতে হারলো কে?

পুরু? না বাবা! আলেকজান্ডারই হেরেছ। তা হ’লে আমরা তা পাই না কেন? এই তো তোরা জিজ্ঞাসা করবি? তা বাবা, ইতিহাসটি লিখেছে কে? গ্রীকরাই তো? তারা এখন কী করে বলে তাদের আলেকজান্ডার হেরেছে, বিশেষ করে আলেকজান্ডার যখন তাদের ন্যাশনাল হীরো! আমাদের দেশের কেউ যদি ইতিহাস লিখত তাহলে আমরা অন্য কথা আজ শুনতুম। দেখ না বিচার করে একটু।

আলেকজান্ডার কোনপথ দিয়ে এল আর কোন পথ দিয়ে গেল? এল যে পথ দিয়ে সে পথ দিয়ে গেল না। গেল একটা লঙ্গেষ্ট রাউন্ড এ্যাবাউট রুট দিয়ে। কেন? তাকে ডেজার্ট ক্রস করতে হয়েছে, পাহাড় ডিঙোতে হয়েছে। কেন জানিস? পুরু তার যাবার পথ পর্যন্ত বন্ধ করে দিয়েছিল। বুঝলি? তারপর ধর এত শিগগীর সে কেন ফিরে গেল? সৈন্যরা ক্লান্ত, তারপর দেশ থেকে তাড়াতাড়ি চলে আসবার খবর এসেছিল, সেইজন্যে। কেন? দেশে আলেকজান্ডার তার মাকে রাজ্যের উত্তরাধিকারীনী করে এসেছিল। তখনকার দিনে দেশ জয়ে বেরোবার আগে এটা করা রীতি ছিল। তার মাকে সাহায্য করার জন্য অ্যারিস্টটলকে রেখেছিল— মন্ত্রণার জন্য। এ্যারিস্টটল খুব বিচক্ষণ লোক ছিল। দেশের রাজনৈতিক অবস্থা খুব ভাল বুঝত। তখন গ্রীকদের মধ্যে খুব দলাদলি ঝগড়া— মা-বাপ-ভাই-বোন ছিল না।

তুমি আমার শত্রু দ্যাট ইজ এনাফ্। ম্যরালিটির অভাব। তা তখন একটা রিভোল্ট (বিদ্রোহ) হবার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। অ্যারিস্টটল বহুপূর্বে সেটি বুঝতে পেরে আলেকজান্ডারকে চিঠি লেখে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এরকম যেখানে আর্জেন্সী সেখানে আলেকজান্ডারের শর্টেস্ট ওয়ে ধরা উচিত ছিল। তা না ধরে একটা রাউন্ড এ্যাবাউট ওয়ে কেন নিল? যদি বলো ভুল, তাহলে বলতে হয় আলেকজান্ডার ভুল করবার ছেলে ছিল না।

এই সিদ্ধান্তের সমর্থন পেয়ে গেলুম যখন দেখি ভিক্টর হুগো লিখছে আলেকজান্ডার ডিড্ নট্ ফেয়ার ওয়েল ইন্ ইন্ডিয়া। ... আর এতদিন পরে (জানুয়ারী ১৯৬৪) আর একজন বিদেশীর মুখে তার সমর্থন পাওয়া গেল। রাশিয়ার সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মার্শাল জুকভ ভারতবর্ষে এসে এক সৈন্য সমাবেশে ভারতীয় সৈন্যদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন যে আপনারা সেই সব বীরের বংশধর যারা গ্রীকবীর আলেকজান্ডারকে পরাজিত করেছিলেন।

ওরে এসব কী কথা হচ্ছে। দূর! দূর! কেবল ঠাকুর ঠাকুর আর কিছু না। নে কথামৃত পড়।''

এই ব্রিটিশ মিউজিয়ামেই তিনি বিখ্যাত শিল্পী রবি ভার্মার ছবির সাথে পরিচিত হন। এছাড়া তিনি লন্ডনে মাদাম টুসোর মোমের পুতুলের প্রদর্শশালাও দর্শন করেছেন। পরবর্তীকালে কথা প্রসঙ্গে তাঁর 'ধর্ম ও অনুভূতি' গ্রন্থে রবি ভার্মার ছবি ও মাদাম টুসোর মোমের পুতুলের কথা উল্লেখ করেছেন।

দেশে ফিরেই প্রথমে চাকরীর দরখাস্ত পাঠালেন কার্সিয়াং মিউনিসিপ্যালিটিতে। দরখাস্তের ভাষাতেও ফুটে উঠেছে তাঁর চাহিদাশূন্য মনের পরিচয়। তিনি লিখেছিলেন অনুগ্রহ করে আপনার অধীনে মিউনিসিপ্যালিটির যে কোন পদে আমার একটা কাজের ব্যবস্থা করে দেবার আবেদন জানাই। আমি কোন বড় পদ চাই না, যত ছোট পদই হোক না কেন দেহে প্রাণরক্ষার ন্যূনতম ব্যবস্থা হলেই আমি নিজেকে ভাগ্যবান বলে মনে করব। (..... I approach you if you very kindly provide me somewhere under you in the Municipality. I am not very particular about getting any big post but I shall think myself

fortunate if you favour me with some post however low it may be to enable me to keep my body and soul together ...)।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের একটি অনুভূতি এখানে স্মরণ করা যেতে পারে। একদিন তিনি বাজার করে থলি হাতে ফিরছেন। এক পুকুর পাড়ে এসে হঠাৎ ঘুরপাক খেতে লাগলেন আর ভীষণ আনন্দ হতে লাগল। মনে প্রশ্ন জাগল, এত আনন্দ হচ্ছে কেন? ভিতর থেকে উত্তর এল— 'আমি তো কিছু চাইনি তাই আমার এত আনন্দ'।

কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরীর একটা সুযোগ পেলেন তিনি। কিন্তু সেখানেও উপযুক্ত পদ খালি না থাকায় খুব নীচের পদে কাজ নেন। অতি সামান্য বেতন। পদের নাম বৃক্ষসংক্রান্ত তত্ত্বাবধায়ক (Arboricultural Overseer)। কোন সাইনবোর্ড রাস্তায় ঢুকে গেছে কি'না এবং রাস্তার ধারে যেসব গাছ লাগানো হত তার পরিচর্যা ঠিকমত হচ্ছে কি'না ইত্যাদি বিষয় দেখতে হত। তাই শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে তিন মাসের এক সংক্ষিপ্ত ট্রেনিং নেন। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য তাঁর স্মৃতিশক্তি ছিল অসাধারণ। অবসর গ্রহণের পরও বেড়াতে বেড়াতে চোখের সামনে পড়া দুর্লভ গাছগুলির বৈজ্ঞানিক নাম বলে দিতে পারতেন যা তাঁর সঙ্গলাভকারী উদ্ভিদ বিজ্ঞানের মাস্টার ডিগ্রিধারী ব্যক্তিদেরও বিস্মিত করতো।

এই কাজের জন্য সাইকেল ভাতা (Allowance) দেওয়া হত। তখনকার কালে (১৯২২) এই ভাতা ছিল কুড়ি টাকা, যার মূল্য তুচ্ছ নয়। কিন্তু তিনি ছিলেন সততার উজ্জ্বল প্রতিমূর্তি। তিনি জানালেন যে তিনি তার কাজে সাইকেল ব্যবহার করেন না তাই সাইকেল ভাতা নিতে অপারগ।

দোকানের হোর্ডিং রাস্তায় ঢুকে পড়লে ওনাকে রিপোর্ট করতে হত। তাতে অফিসারের ঘুষ নেওয়ার অসুবিধা হতে লাগল। তখন উর্ধ্বতন অফিসার বললেন, জীবনবাবু, এবার থেকে লগবুকে নোট লেখার ও রিপোর্ট তৈরীর কাজটা আমিই করব, ওটা আপনাকে করতে হবে না। উনি ঐ দায়িত্ব ছেড়ে বাঁচলেন।

চাকরী পাওয়ার পরও মাইনে খুব কম হওয়ায় তিনি কিছুদিন ছোটখাট একটি ব্যবসাও করেছিলেন বসন্ত সামন্ত নামে এক বন্ধুর সাথে যৌথভাবে (জুটমিলে রিপেয়ারিং-এর কাজ)। পরে বন্ধু কারবার ছেড়ে দিলে তিনি একাই কয়েকমাস ব্যবসা চালান। যেহেতু বন্ধু লিখিত-পড়িত ভাবে কারবার ছাড়ে নি তাই এ ক'মাসের লভ্যাংশের টাকা তারও প্রাপ্য হয়। সেই টাকা তাকে নিতে অনুরোধ করেন। বন্ধুটি টাকা নিতে অস্বীকার করলে উকিলের চিঠি পাঠিয়ে তাকে টাকা নিতে বাধ্য করেন। এই আচরণে তাঁর সততার যে পরিচয় ফুটে উঠেছে জগতে তার তুলনা মেলা ভার।

তখন সবে জুনিয়র স্যানীটরী ইন্সপেক্টর পদে উন্নীত হয়েছেন। একদিন কাজ সেরে বাড়ী ফেরার পর মাসীমা (যাকে তিনি জ্ঞানমা বলে ডাকতেন) হঠাৎ হাসতে হাসতে ওনাকে বললেন, ওরে আজ সামনের বাড়ীর ভদ্রমহিলা বেড়াতে এসেছিল। ও বলছিল তোমার ছেলে কর্পোরেশনের ইন্সপেক্টর, তা তোমরা কেন ভাড়া বাড়ীতে থাক? উনি হেসে বললেন, তুমি কি বললে জ্ঞানমা! জ্ঞানমা বললেন, আমি আর কি বলব, চুপ করে রইলুম। তা বাবা এখন তোকেই জিজ্ঞাসা করি। উনি বললেন, বুঝলে না মা, ওরা তোমার ছেলেকে চুরি করতে বলছে। তবে শুনবে? আমি যেখানে কাজ করি ওখানে সহজেই ঘুষ নিয়ে রাতারাতি মস্ত বড় ইমারত গড়া যায়। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে জ্ঞানমা অন্য প্রসঙ্গ পাড়লেন।

এমনি একদিন ইন্সপেকটরের পোষাক পরে দুপুর রোদে ছাতা মাথায় হনহন করে কলকাতার কোন এক রাস্তা দিয়ে তিনি হাঁটছিলেন। সেখানে তার পিসীমার বাড়ি ছিল। তাঁর পিসীমা খুব ধনী ছিলেন। পিসীমা বারান্দা থেকে ভাইপোকে চিনতে পেরে এক দারোয়ানকে পাঠালেন ডেকে আনতে। দারোয়ান এসে বলল, 'বাবু, মাইজি আপনাকে ডাকছেন।' উনি বললেন, ঠিক আছে, তোমার মাইজিকে বোলো আমি এখন কাজে যাচ্ছি। বলেই এগিয়ে গেলেন. পিসীমার বাড়ী আর যাননি। সেদিন সন্ধ্যায় জ্ঞানমাকে ঘটনাটা বললেন। জ্ঞানমা শুনে বললেন, সেকী রে, তোর পিসীমা ডেকে

পাঠালো আর তুই গেলি না? উনি বললেন, বুঝলে না, ওরা যে বড়লোক। হ্যাঁ গো বড়লোকের সঙ্গে বেশি মাখামাখি করতে নেই।

এবার মাসীমা তাঁর বিয়ের জন্য জিদ ধরলেন। তিনি মাসীমার কথার অবাধ্য হননি কখনও। তাই তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ হলেও মাসীমায়ের কথা রাখতে তিনি তাঁর বন্ধুদের নিয়ে পাত্রী দেখতে গেলেন। ফিরে এলে মাসীমা জিজ্ঞাসা করলেন, হ্যাঁরে, মেয়ে কেমন দেখলি? উনি উত্তরে বললেন, ঠিক আমার মায়ের মত দেখতে। মুহূর্তে মাসীমা বুঝলেন, এ ছেলের বিয়ের জন্য জোর করা ঠিক হচ্ছে না। তাই এ প্রসঙ্গ ধামাচাপা দিলেন চিরতরে।

এ প্রসঙ্গে ঠাকুরের একটি কথা স্মরণ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, 'মা, আবার যদি শরীর ধারণ হয় যেন সংসারী করো না'। পরজন্মে নয়, পরের প্রজন্মে (next generation-এ) তাঁর 'উত্তরসূরী' শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে তাঁর সেই কামনা পূরণ হয়েছিল।

কলকাতা মহানগরীর স্যানীটরী ব্যবস্থা প্রথম থেকেই ছিল ত্রুটিপূর্ণ। এই ত্রুটি দূর করার জন্য কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত সে বিষয়ে উনি দুটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন যা কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে প্রকাশিত হয়েছিল ১৯২৬ সালে। কিন্তু উনি নিম্নপদের এক কর্মচারী, তাই তাঁর সুপারিশ কার্যকরী করতে চাইলেন না ঊর্ধ্বতন অফিসার। তার মিথ্যা অভিমানে ঘা লেগেছিল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তখন এ বিষয়ে মেয়রকে চিঠি দিলেন। কাজ না হওয়ায় ছদ্মনামে স্টেটস্‌ম্যান পত্রিকার সম্পাদককে খোলা চিঠি দিলেন সব জানিয়ে। কিন্তু এতসব সত্ত্বেও কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে কোন ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করেন নি। যার খেসারত দিতে হচ্ছে কলকাতাবাসীদের আজও। লক্ষ্যনীয় বিষয় হ'ল— কর্মক্ষেত্রে কর্তব্যপালনে তিনি ছিলেন আপোষহীন।

চাকুরীরত অবস্থায় সহকর্মীদের সাথে একবার বেড়াতে গিয়েছিলেন রামেশ্বর। তিন দিন পর ওখানে পৌঁছে প্রথমেই ওনার মনে হল এতদূর রাস্তা ঠাকুরের বাবা ক্ষুদিরামবাবু পায়ে হেঁটে এসেছিলেন কী করে?

তখন ওনার গায়ের রঙ ছিল সাহেবের মতো লাল, আর সাহেবের পোষাকেই গেছেন এক দোকানে জিলিপী কিনতে। দোকানদার গোঁড়া হিন্দু। খৃষ্টান সাহেব ভেবে তাঁকে জিলিপী দিলেন না। ধর্মীয় গোঁড়ামী এভাবেই অজ্ঞাতসারে মানুষকে ঈশ্বরবিমুখ করে।

অনুরাগী কয়েকজনের সাথে পুরীতে থাকার সময় একবার পাচক ঠাকুর ওনাকে প্রশ্ন করেছিল, আচ্ছা লঙ্কায় এখনও বিভীষণ রাজা হয়ে আছেন তো? শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাকে বোঝাতে লাগলেন, লঙ্কা হল মানুষের সহস্রার। সেখানে রাবণ অর্থাৎ 'আমি কর্তা'— বোধ বিরাজ করে। পরে রাম অর্থাৎ পরম এক ব্রহ্মের প্রকাশ হলে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। শ্রীভগবানই কর্তা, আমি কিছু নই— এই জ্ঞান নিয়ে মানুষটা বেঁচে থাকে। এই জ্ঞান অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞানের প্রতীক হলো বিভীষণ। পাচক ঠাকুর চুপ করে শুনল বটে কিন্তু বুঝল বলে মনে হল না। শ্রীজীবনকৃষ্ণ দুঃখ করে বললেন, এই দেশটার কী হবে বাপু!

তখনও রিটায়ার করেন নি। মাস খানেকের ছুটি নিয়েছেন। এক ডাক্তার বন্ধু তার শান্তিপুরের বাড়ীতে গিয়ে ছুটি কাটানোর অনুরোধ করলে উনি বললেন, যদি বাড়িটা আমাকে ভাড়া দাও তাহলে যাব। বন্ধু রাজী হলে কয়েকদিন শান্তিপুরে কাটিয়ে এলেন।

চাকরীতে ওনার প্রমোশন হয়েছিল বেশ দেরীতে। বদলি হয়েছিলেন কর্পোরেশনের অধীনে রেলওয়ে ট্রাফিকে। শেষে প্রধান ও মুখ্য করনিক হয়ে অবসর গ্রহণ করেছিলেন ১৯৫৩ সালের ১৫ই জুন।

অফিসের প্রত্যেকেই ছিলেন তাঁর প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। প্রায়শঃই ঘুষের পয়সায় অফিসে চা-মিষ্টি খাওয়া চলত কিন্তু তাঁকে কেউ কখনও তা দেবার কথা ভাবতেও পারত না। অত কর্মীর মধ্যেও তিনি ছিলেন অদ্ভুত ব্যতিক্রম।

তাই অবসর গ্রহণ কালে বিভাগীয় সহকর্মীদের নিবেদিত শ্রদ্ধাঞ্জলির প্রতি ছত্রে ফুটে উঠেছিল তাঁর কর্মজীবনের মাঝে সততার উজ্জ্বল মহিমা

তথা তাঁর দিব্যজীবনের অপূর্ব অভিব্যক্তি। সেই অভিনন্দন পত্রে লেখা হয়েছিল— 'আমরা দিনের পর দিন তোমার সত্যনিষ্ঠা, সত্যাচরণ লক্ষ্য করেছি। তোমার নির্মল বুদ্ধির দিব্যজ্যোতিতে স্নান করে ধন্য হয়েছি। সেই পুণ্যজ্যোতি আমাদের ভাবী জীবনের পথকে আলোকিত করুক। ... হে সাধু তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।'

পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দিকে ছিল ওনার খুব নজর। রুমালটি পর্যন্ত পরিপাটি করে ভাঁজ করে রাখতেন। দুখানি গামছার একটিতে মুখ মুছতেন অন্যটি পা মোছার জন্য আলাদা রাখা থাকত। কিন্তু কোন প্রকার বিলাসিতা তাঁর ছিল না। অতিরিক্ত কোন পোষাক ছিল না। এদিকে শোবার খাট, একটি টিনের বাক্স, একটি ছাতা, একটি কলাইকরা গ্লাস, একটি জলের কুঁজো ও কয়েকটি হাতপাখা মাত্র সম্বল ছিল তাঁর।

গার্জেন হিসাবে ছিলেন খুব কড়া। ভাইপোদের পড়াশোনার উপর খুব নজর রাখতেন। মাঝে মাঝে ডেকে পড়া ধরতেন। নিজের কাছে বসিয়ে পড়াতেন। সন্ধ্যাবেলা সকলকে নিয়ে বসতেন প্রার্থনায়। ভাইপোরা সুর করে গাইত— 'ভবসাগর তারণ কারণ হে ...।' কোন কোন দিন অফিস থেকে ফিরতে দেরী হলে জামা না খুলেই ওদের সঙ্গে বসে প্রার্থনায় যোগ দিতেন।

এবার তাঁর সাহিত্যচর্চা প্রসঙ্গে আসা যাক। তিনি শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট সান্নিধ্যে এসেছিলেন। একবার শরৎবাবুর পল্লীসমাজ উপন্যাসটি নোবেল সোসাইটিতে পাঠাবার উদ্যোগ হয়েছিল। এই উদ্দেশ্যে বইটির ইংরাজী অনুবাদের ভার পড়েছিল তিন জনের উপর। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাদের অন্যতম। তাঁর অনুবাদটিই শরৎচন্দ্রের সর্বাধিক প্রশংসা পেয়েছিল। অবশ্য উদাসীন শরৎবাবু শেষপর্যন্ত তা পাঠাননি। ইংরাজী সাহিত্যে তাঁর যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। পড়েও ছিলেন বেশ কিছু। চাকরী করাকালীন কয়েকবার বেঙ্গল বোর্ডিং-এ ছিলেন। একবার পাশের কামরায় বোর্ডার ছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক ইংরাজীর অধ্যাপক। শেক্সপীয়রের লেখা নিয়ে তার সাথে বেশ আলোচনা হচ্ছিল। তিনি

কথায় কথায় বললেন, শেক্সপীয়রের কোন মিষ্টিক ড্রামা নেই। জীবনকৃষ্ণ বললেন, সে কী মশাই, Twelfth Night টা তবে কী? ওটা তো purely mistic। তখন তিনি আবার শ্রীজীবনকৃষ্ণের কথা মেনে নিলেন। নাট্যব্যক্তিত্ব অহীন্দ্র চৌধুরী, দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু লাহিড়ী প্রভৃতিদের সাথে ওনার আলাপ ছিল। নিজেও কিছু কিছু নাটক লিখেছিলেন। তাঁর লেখা নাটক 'যুগধর্ম' কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রচারিত হয়েছিল। পরে সে সব পাণ্ডুলিপির আর খোঁজ রাখেন নি। বর্তমানে 'বোধিসত্ত্ব' নামে একটি মাত্র নাটকের পাণ্ডুলিপি আছে। এই অনবদ্য নাটকটি লিখেছিলেন ৩২/৩৩ বছর বয়সে। তখন থেকেই তাঁর মনে মৃত্যুকে জয় করার উদগ্র বাসনা জেগে উঠেছিল। সেই মনোভাবই প্রতিফলিত হয়েছে এই নাটকে।

সম্প্রতি 'মধুস্মৃতি' নামে কবি মধুসূদনের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর লেখা একটি অনুপম কবিতার পাণ্ডুলিপির খোঁজ পাওয়া গেছে। মধুসূদনের ঢঙেই অমিত্রাক্ষর ছন্দে লেখা আটপাতার এই দীর্ঘ কবিতায় তাঁর কবিত্ব শক্তির যে অসাধারণ পরিচয় ফুটে উঠেছে তা পাঠককে বিস্মিত করে।

তিনি শুরু করেছেন এইভাবে—

'মধু, মধু, মধু, মধুময় মধুস্মৃতি,
মধুকালে মাধবী-নিকুঞ্জে মাধুরীর
মদিরা মোহেতে, চিরতরে মাতাইয়া
রেখেছে ভুবন। হে কবি শ্রীমধুসূদন—'

প্রথমে মেঘনাদ বধ কাব্যের অংশ বিশেষের চিত্রল বিন্যাসের পর তিনি যখন ব্রজাঙ্গনা কাব্য পরিক্রমা শুরু করেছেন, সেখানে তাঁর মধুস্রাবী লেখনী হতে উৎসারিত নির্ঝরিনীর কলকল্লোল শুনতে পাই—

'আজি মধুর কৈশোর অতিথি আমার
দ্বারে— (হে) কবি, চমকি শুনিনু, তব বীণা
বাজে দূর যমুনা পুলিনে— রাধা সতী

ব্রজের দুলালী ব্রজপুরে, বিজনেতে
বসে বালা ব্রজেশ্বর তরে ফেলে
আঁখিজল। মরি মরি মুকুতার বাস
রূপ ধরি আসে নেমে নয়নের বারি
বিরহ ব্যাকুলা প্যারী— কোমল কবির
প্রাণ ব্যথিতার তরে ফুকারি উঠিছে
কাঁদি। ...'

কখনও বা,

'মরি মরি কবি তুমি কি দেখালে মোরে
নহে এ তো রাধার নয়ন বারি— এ যে
তব প্রেমবারি ঝরিতেছে ঝর্ ঝর্
করি ঝরাফুল সম। আজি তব প্রেম
উঠিছে উথলি— আজি তব ব্যথা হা হা
রবে আছাড়ি পড়িছে বিশ্বে— এ বিরহ
নহে নহে রাধার বিরহ— তব হৃদে
নিতি নিতি জাগে এ বিরহ— তাই তুমি
উদাস পরাণে গাহিলে বঙ্গের কোণে
'চল্ লো জুড়াব আঁখি দেখি মধুসূদনে।''

এরপর বীরাঙ্গনা ও চর্তুদশপদী কবিতাবলীর মহত্ত্ব স্মরণ করে কবি বন্দনার একেবারে শেষভাগে কবি শ্রীজীবনকৃষ্ণের অন্তঃসত্তার মূল সুরটি সংযুক্ত হয়েছে। কবিকৃতির অমরতা প্রত্যাশী কবি মধুসূদনের উদ্দেশ্যে কবি শ্রীজীবনকৃষ্ণের লোকতারণের অমেয় নিভৃত আর্তি অনুরণিত হয়ে উঠেছে—

'আজি লভিয়াছ অমরতা
হে প্রিয়, অমর তুমি— এ মর মরতে।'

এছাড়া ‘পুরুষোত্তম’ নামে একটি গানে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রতি তার আত্মনিবেদনের ভাবটি সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। পরে ‘তীর্থযাত্রী’ নামে একটি কবিতায় রামকৃষ্ণতীর্থ পরিক্রমা করে আরও এগিয়ে যাওয়ার তথা নিজস্ব মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী জেগে ওঠার ইঙ্গিত স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। পরবর্তীকালে রামকৃষ্ণকথামৃতের যৌগিক ব্যাখ্যা ছাড়া অন্য কিছু তিনি রচনা করেন নি।

যৌবনে তিনি অনেক পদাবলী লিখেছিলেন। শিখিয়েছিলেন স্বয়ং চন্ডীদাস— স্বপ্নে ফুটে উঠে। যদিও সেসব পদাবলীর কোন পাণ্ডুলিপি এখন আর পাওয়া যায় না। বর্তমানে বোধিসত্ত্ব নাটকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে তাঁর রচিত একটি মাত্র পদাবলী রয়েছে।

সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখেছেন— কবির কবিত্ব বুঝিয়া লাভ আছে সন্দেহ নাই কিন্তু কবিত্ব অপেক্ষা কবিকে বুঝিতে পারিলে আরও গুরুতর লাভ। তাই কাব্য ছেড়ে ফিরে যাওয়া যাক্ কবির জীবনে।

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (স্বনামধন্য লেখক ও হাওড়া জেলা কংগ্রেসের সভাপতি), নেতাজী সুভাষচন্দ্র বোস, বিপিন বিহারী গাঙ্গুলী ইত্যাদি বিশিষ্ট রাজনৈতিক ব্যক্তিদের সঙ্গে ওনার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। নিত্যসঙ্গীদের অনেকেই ছিলেন সক্রিয় রাজনৈতিক কর্মী।

দেশপ্রেমের আগুন বুকে চেপে রেখে প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে নিজেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। অন্তরে প্রজ্বলিত আধ্যাত্মিক চৈতন্যের শিখাটিকে অনির্বাণ রাখার জন্য জীবন প্রদীপের সমস্ত তেলটুকু নিঃশেষে ব্যয় করেছিলেন। তবুও দেশপ্রেমের অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার কখনও কখনও বহিঃপ্রকাশ ঘটে যেত। তখন অন্যের চোখেও তা ধরা পড়ত।

১৮ই জুলাই ১৯৬৩, পুরীতে আছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। ডঃ বিমান বিহারী মজুমদারের লেখা বিশ্ববিবেক বই থেকে স্বামীজির উদাত্ত আহ্বানের কথা পড়ে শোনাচ্ছেন এক অনুরাগী— ... নূতন ভারত বেরুক। বেরুক লাঙল ধরে, চাষীর কুটীর ভেদ করে, জেলে, মালা, মুচি মেথরের ঝুপড়ির মধ্য হতে। বেরুক মুদির দোকান থেকে, ভুনাওয়ালার উনুনের পাশ থেকে। বেরুক কারখানা থেকে, হাট থেকে, বাজার থেকে, বেরুক ঝোপজঙ্গল পাহাড় পর্বত থেকে ...।’

শুনতে শুনতে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দু’চোখ বেয়ে অশ্রু নেমে এল। তিনি বললেন— ‘আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। জর্জ ওয়াশিংটনের এই আহ্বান। গোটা আমেরিকা এইরকম ছুটে এসেছিল। আমেরিকার থার্ড প্রেসিডেন্ট (টমাস্ জেফারসন) মাঠে চাষ করছিলেন, লাঙল ফেলে ছুটলেন ওয়াশিংটনের সংগে স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে। এ দৃশ্য স্বামীজি সেখান থেকে নিয়েছেন।

আহা। এ যে মুক্তির ডাক, হোক সে বাইরের বন্ধন থেকে মুক্তি, কিন্তু তা না হলে যে ব্রহ্মজ্ঞানও হয় না।

১৯৪৭ সালের ১৫ই আগষ্ট ভারত স্বাধীন হয়েছে। তার তিন দিন আগে থেকে আমি যে কী ছট্ফট্ করেছি কী বলব। এই তিনটে দিন যেন আমার দেহটা থাকে। নিজেকে বাঁচিয়ে সাবধানে চলি, যেন অ্যাক্সিডেন্ট না হয়। এমন কিছু না খাই যাতে অসুখ করে। আমি যেন ঐ তিনটে দিন বেঁচে থাকি। স্বাধীনতার দিন সকালেও যদি মরি তাতেও শান্তি। কেন যে আমার অত ব্যাকুলতা হয়েছিল দশ বছর পর অষ্টাবক্র সংহিতা পরে তা বুঝতে পেরেছিলাম।

পরাধীন জাতির ব্রেনে একটা প্রেসার (চাপ) থাকে। ফলে ব্রেনের কোন অংশ নিষ্ক্রিয় (dormant) থেকে যায়। স্বাধীনতা পেলে তবে সেটা ফোটে। স্বাধীনতা লাভের পর তাই পরমব্রহ্মত্ব অবস্থা লাভ হতে পারে। ঐ যে অষ্টাবক্র সংহিতায় লিখছে পূর্ণ স্বাধীন অবস্থায় স্ব-স্বরূপ দর্শন হয়— স্বাধীনতায় পরমব্রহ্ম লাভ হয়, স্বাধীনতায় শান্তি ও মুক্তি লাভ হয়— ওতে সেই কথাই বলা হয়েছে।’

১৯৬১ সালের ২১শে ডিসেম্বর একজন ভক্ত ওনার ঘরে ঢুকে বললেন, গতকাল গোয়া পর্তুগীজ শাসনমুক্ত হয়ে ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ

শোনামাত্র আনন্দে অধীর হয়ে উঠলেন। এমনিতে উনি খবরের কাগজ পড়তেন না। কিন্তু তখন বললেন, ওরে একটা খবরের কাগজ নিয়ে আয় তো। ওরে বাবা কী সুখবরই না শোনালি। ওটা যে ভারতের পক্ষে কত বড় শৃঙ্খল ছিল তা আর কী বলব। আহা কী আনন্দ যে হচ্ছে। কে মুক্ত করল বাবা? ভদ্রলোক বললেন, জেনারেল জয়ন্ত চৌধুরীর নেতৃত্বে ভারতীয় সেনাবাহিনী বিনা রক্তপাতে গোয়াকে পর্তুগীজদের শাসনমুক্ত করেছে। শুনে বললেন, আহা, ও (জয়ন্ত চৌধুরী) খুব বড় মানুষ রে। এসব কথা বলছেন আর দুচোখ বেয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে দেখে সকলে অবাক হলেন। আজও কতজন ভারতীয় গোয়ায় বিদেশী শাসনের অবলুপ্তি ও তার ভারতভুক্তিকে ভারতের পক্ষে কলঙ্ক মোচনের উজ্জ্বল ঘটনা বলে অনুভব করতে পারেন?

এক সময় তিনি মঠে খুব যাতায়াত করতেন। সাধুসেবার জন্য সংগে করে নিয়ে যেতেন ঠোঙা নয়, চাঙারি ভর্তি ফলমূল। ভাবতেন রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা না জানি সব এক একজন ঠাকুর বা স্বামীজী হয়ে বসে আছেন। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন বুঝলেন মঠের মহারাজদের দর্শন অনুভূতি নেই তখন মর্মাহত হয়ে মঠে যাওয়া বন্ধ করে দিলেন। মঠের অনেককে হাতজোড় করে জিজ্ঞাসা করেছিলেন— মহারাজ, ঠাকুর রামকৃষ্ণকে আপনি স্বপ্নে কি কোনদিন দেখেছেন? প্রত্যেকেই উত্তর দিয়েছেন, ‘না। কতদিন শোবার সময় কেঁদেছি আর ঠাকুরকে জানিয়েছি স্বপ্নেও একবার দেখা দাও ঠাকুর, কিন্তু পাইনি জীবনবাবু!’

বহু পরের ঘটনা, ১৯৫৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একদিন পরমপুরুষ শ্রীরামকৃষ্ণ বইয়ের লেখক শ্রীঅচিন্ত্য সেনগুপ্ত এলেন ওনার ঘরে। শ্রীরামকৃষ্ণ প্রসঙ্গে কিছুক্ষণ আলাপ করার পর শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, আচ্ছা, আপনি তো ঠাকুরকে নিয়ে বই লিখেছেন। ঠাকুরকে নিশ্চয়ই বুঝেছেন। আমি বলছি— আমার ঠাকুর (হুঙ্কার দিয়ে)— শুধুই আমার। Now oppose me. নিন আমার কথা কাটুন। অচিন্ত্যবাবু ওনার মুখের দিকে ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করে তাকিয়ে থাকলেন, মুখ দিয়ে কোন কথা সরল না।

তাঁর শ্রীরামকৃষ্ণপ্রেম ছিল সর্বসংস্কারমুক্ত, সাধারণের ধারণার বাইরে। একবার বুদ্ধদেবের শিষ্য মৌদ্‌গল্যায়ণের দাঁত নিয়ে আসা হয়েছিল কলকাতার মহাবোধি সোসাইটিতে। তাই নিয়ে হৈ চৈ, শোভাযাত্রা ইত্যাদি চলতে লাগল কলকাতায়। এসব শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, আমাকে যদি কেউ ঠাকুরের দাঁত এনে দিত আমি কি করতাম জানিস? হাওড়ায় ব্রীজ পেরোবার সময় টুক করে সেটা গঙ্গায় ফেলে দিতাম।

শশী মহারাজ কাশীপুর বাগানে ঠাকুরের অসুখের সময় গরমে অনবরত হাতপাখা নিয়ে তাঁকে বাতাস করতেন। তিনি লীলা সম্বরণ করার পর তাঁর শরীর যখন চিতায় জ্বলছে সে সময়েও শশী মহারাজ কাঁদতে কাঁদতে তাঁর শরীরের উপর হাতপাখা টেনে বাতাস করেছেন। এ কাহিনী অনুরাগীজনদের যখন শোনাতেন, ভাবে বিভোর হয়ে যেতেন। হাত নেড়ে পাখা করার ভঙ্গীটিও দেখাতেন। কিছু পরে বলতেন, আমি হলে কী করতুম জানিস, আমি ঐ জ্বলন্ত চিতায় ঝাঁপ দিয়ে প্রাণত্যাগ করতুম। যাকে ভালবাসি তিনি চলে যাবেন আর আমি বেঁচে থাকবো? সে আমি সইতে পারতুম না।

একবার মঠে নিরালায় বসে প্রবীণ এক মহারাজের (জ্ঞান মহারাজ) কাছে শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন রেখেছিলেন, আচ্ছা মহারাজ, ঠাকুর যে বলেছেন, সচ্চিদানন্দ লাভ না হলে কিছু হবে না— সেটা কি? উনি ঝাড়া দুঘণ্টা ধরে বিভিন্ন শাস্ত্র উদ্ধৃত করে বোঝালেন। পরে মঠের অন্য সন্ন্যাসীরা তাঁকে ধরে বসলেন— এতক্ষণ ধরে মহারাজের কাছে কী শুনলেন আমাদের একটু বলুন। উনি বললেন, আমি সচ্চিদানন্দের মানে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তার উত্তরে উনি যা বললেন তার সারমর্ম এই যে এক গ্রামে একজন সৎ লোক ছিল। প্রতিবেশীরা তা জানতে পেরে তাকে চিৎ করে ফেলে তার বুকের উপর চেপে আনন্দ করতে লাগল।

এই রসিকতার মধ্যে তাঁর হৃদয়ের অব্যক্ত যন্ত্রণা প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর দেহে সৎ-এর প্রকাশ ঘটেছে। তাই জগতের মানুষকে ধর্মকথা বোঝানোর দায়িত্ব যে সব আচার্য পুরুষদের হাতে তাদের মুখে ধর্মের অপব্যাখ্যা শুনে তিনি মরমে পীড়িত হতেন।

তারপর একদিন স্বপ্নে ঠাকুর তাঁকে মঠে যেতে নিষেধ করে দিলেন। কেননা ওদের ওসব বিবিদিষাপন্থীদের কথা। তাঁকে ঠাকুর মঠে নিয়ে গিয়েছিলেন শিক্ষা দেবার জন্য।

লোকেনবাবুর বড়দা রামকৃষ্ণ মিশনে থাকতেন। পরে সন্ন্যাসী হয়ে হিমালয়ে চলে যান। নাম হয় স্বামী বৈকুণ্ঠানন্দ। তিনি খুব তিতিক্ষাযুক্ত সাধু ছিলেন। তাই শ্রীজীবনকৃষ্ণের মনে হয়েছিল, ভদ্রলোকের ভগবান দর্শন হয় নি। কারণ ভগবান লাভ হলে ঐ রকম দৈহিক ক্লেশ সহ্য করতে পারতো না। ঠাকুরের জীবন দেখলেই একথা বোঝা যায়। একবার লোকেনবাবু জানালেন তার দাদা ফিরে এসেছেন। জীবনকৃষ্ণ তার সাথে দেখা করতে গেলেন। তার কাছে গিয়ে প্রথম প্রশ্ন করলেন— মহারাজ, আপনার ভগবান দর্শন হয়েছে? সাধু উত্তরে বলেছিলেন, না। শুনে উনি বললেন, আপনি প্রকৃত সাধু। বলেই একটা প্রণাম করলেন। তারপর ধর্ম সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হ'ল। পরে একদিন উনি জীবনকৃষ্ণের কাছে এলেন দেখা করতে। উনি অনাথের (মণ্ডল) মুখ দিয়ে বেদের পঞ্চকোষের সাধন এবং অবতারতত্ত্ব পর্যন্ত বলিয়ে নিলেন। বোঝাতে চেষ্টা করলেন, এ ঘরের শিশুটি পর্যন্ত এসব কথা জানে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কিছু আগে তিনি মাঝে মাঝে মাসীর বাড়ী উলুবেড়িয়ার কাছে আলিপুকুরে গিয়ে থাকতেন। গ্রামের লোকেরা তাঁকে খুব ভালবাসত। সকলে বড়বাবু বলে ডাকত। তিনি সকলের সাথে মিশতেন। গ্রামের গরীব ছেলেদের জন্য কলকাতা থেকে নানারকম খাবার নিয়ে যেতেন। একবার তিনি ঠিক করলেন এখানে একটি ধ্যানঘর করবেন। কেননা তিনি ধ্যান করতে খুব ভালবাসতেন। প্রায়শই গভীর ধ্যানে ডুবে যেতেন। ঝাঁকে ঝাঁকে মশা তাঁকে ছেঁকে ধরে রক্ত খেয়ে মোটা হয়ে টুপটুপ করে মাটিতে ঝরে পড়ত, তবু তিনি থাকতেন নির্বিকার।

উনি যখন বেঙ্গল বোর্ডিং-এ থাকতেন, একদিন দুপুরে খাওয়ার পর, ১২টার সময় ধ্যান করতে বসেছেন। খুটখুট শব্দ শুনে চেয়ে দেখেন ক্ষিতিশ,

রাধু আর অভয় খড়খড়ির পাখী খুলে দেখছে। উঠে দরজা খুলে দিলেন। তখন চারটে বাজছে। জিজ্ঞাসা করে জানলেন ওরা আড়াইটার সময় এসেছে। বারোটা থেকে চারটে পর্যন্ত ধ্যান! মহাপুরুষ মহারাজের জীবনীতে আছে— তিনি বলতেন যে, দু'ঘণ্টার বেশি কি ধ্যান করা যায়? ঠাকুর যাকে ধ্যানসিদ্ধ বলেছেন সেই স্বামীজিও বলতেন, দু'ঘণ্টার বেশী ধ্যান হয় না, ধ্যান হালকা হয়ে আসে।

শ্রীরামকৃষ্ণদেব ধ্যান জপ করার উদ্দেশ্যে পঞ্চবটীতে একটি তুলসী কানন গড়ার অভিপ্রায় প্রকাশ করলেন। কিন্তু যোগাড় নেই। কিছুক্ষণ পর বাগানের মালী ভর্তৃহরি নাচতে নাচতে এসে জানালেন আশ্চর্য জোটপাটের কথা। গঙ্গার জলে ভেসে এসেছে দড়ি, তাড়া বাঁধা বাখারি, মায় লোহার কাটারি পর্যন্ত। তাই দিয়ে ঠাকুরের ইঙ্গিত তুলসী কানন তৈরী হয়ে গেল।

কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণের ক্ষেত্রে ঘটল অন্যরকম ঘটনা। যেদিন তার এক ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুকে ধ্যান ঘরের প্ল্যান করতে দিলেন, সেই রাত্রেই তিনি স্বপ্নে দেখলেন— একটি ঘরের দালানে বসে দুটি ছেলে পড়ছে। একটি ছেলে বানান করে পড়ছে— প্রপার্টি (Property) আর একটি বড় ছেলে যেন তার মানে বলছে— অষ্টপাশ। পরপর তিনবার কথাগুলির পুনরাবৃত্তি শুনলেন। ঘুম ভাঙলে ভাবলেন নতুন ডিকশনারী হল নাকি? প্রপার্টি মানে অষ্টপাশ। তারপর ফ্লাশ (Flash) করল, তিনি যে ধ্যানঘর করতে যাচ্ছেন সে তো প্রপার্টিই (বিষয় সম্পত্তি) হবে, আর তাই হবে তাঁর পক্ষে পাশ অর্থাৎ বন্ধন। তাই তিনি ধ্যানঘর করার পরিকল্পনা বাতিল করলেন। পরবর্তীকালে তিনি বলতেন, ওরে, সাধু যখন একটা ইঁট গাঁথে সে ইঁট গাঁথে না, সে নিজেকে গাঁথে।

এযুগে ধ্যানজপের জন্য আলাদা ঘর (ঠাকুর ঘর) দরকার হবে না। শ্রীজীবনকৃষ্ণ যে বিছানায় শুতেন সেই বিছানায় বসেই ধ্যান করতেন। সেটিই ছিল তার সাধনার আসন। তাঁর জীবনই এযুগের মানুষের কাছে আদর্শ।

আর একবার ভেবেছিলেন চাকরী ছেড়ে দেবেন। একলা থাকবেন।

উলুবেড়ে চলে যাবেন। সেখানে থাকবেন, গরু কিনবেন আর এটা ওটা করবেন। এই সময় স্বপ্ন দেখলেন— একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তার সামনে উঁচু একটা জায়গা। সেই জায়গায় একটা ফুলের বাগান। চমৎকার বাগান। সেই বাগানের সামনে রাস্তাটাকে ঘিরে একপাল গরু তার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। বুঝলেন, ঐ গরুই দেবে পথ রুদ্ধ করে। তবু একলা থাকার ইচ্ছা গেল না। ভাবলেন, রামেশ্বর চলে গিয়ে সেখানে থাকবেন। এই একলা থাকার ইচ্ছা কেন তা পরে বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি রয়েছেন সকলের মধ্যে কিন্তু মন রয়েছে অনেক ঊর্ধ্বে। হাওড়া থেকে রামেশ্বর যেমন অনেকটা দূর তেমনি অনেক উপরে। তাই একলা থাকার ইচ্ছা।

সংসার তাঁর অনুকূল ছিল না। তাঁর ব্যবহারিক জীবন ছিল আগাগোড়া দুঃখ দিয়ে গড়া (Full of sufferings)। অকৃতদার শ্রীজীবনকৃষ্ণ থাকতেন তাঁর মাসতুতো ভাই মানিকলাল বসুর বাড়ীতে পৃথক একখানা ঘর (Room) নিয়ে। তখনকার দিনে একবেলা খাওয়া ও থাকার জন্য প্রতি মাসে ২০০ টাকা দিতেন ভাইকে। তাঁর ঘরে বৈদ্যুতিক পাখা ছিল না। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড গরমে হাতপাখা ব্যবহার করতেন। ঘর সংলগ্ন সরু একফালি বারান্দা। সেই বারান্দার বাল্বটি খুলে নিয়েছিলেন মানিকবাবু ইলেকট্রিক বিল বেশী হবে এই যুক্তিতে। ওনার ঘরে বহু মানুষ আসত। তারা ঐ বারান্দায় চটি জুতো খুলে রাখত। আলো না থাকলে রাত্রে নিজের নিজের চটিজুতো খুঁজে পাওয়ার অসুবিধার কথা বুঝিয়ে পরে আবার বাল্বটা লাগানো করিয়েছিলেন। জ্বর হলে একবার মাত্র সাবু দেওয়া হত। দ্বিতীয়বার প্রয়োজন হলে আর সাবুতে চিনি দেওয়া হত না। এ বিষয়ে এক অনুরাগীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি একদিন হেসে বলেছিলেন— বরাদ্দ যে শেষ বাবা! এইভাবে হাসিমুখে সর্বপ্রকার যন্ত্রণা সহ্য করেছেন।

পিঠে কার্বঙ্কল ঘা হল। সেঁক দেবার জন্য গরম জল পেতেন না বাড়ী থেকে। অবশ্য উনি চাইতেনও না। এমনকি ভগবানের কাছেও কখনও কিছু চাননি। মানিকবাবু একদিন যখন জানালেন তার স্ত্রী শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘা

আরোগ্যের জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন, অমনি তিনি যেন আর্তনাদ করে উঠলেন। চিৎকার করে বলে উঠলেন, 'বৌমা, শোন, ভগবানের কাছে কিছু চাইতে নেই।'

পাঁচ তরকারী দিয়ে ভাত খাবার অভ্যাস ছিল। তাই প্রায়দিনই নিজেই বাজার করে এনে দিতেন নিজের পছন্দসই খাবার খাওয়ার জন্য। ওনার যখন চুয়াল্লিশ বছর বয়স তখন ওনার মাসীমা মারা যান। তখন থেকেই উনি খাওয়া অনেক কমিয়ে দেন। অবশ্য মানিকবাবুর স্ত্রী (আশালতা দেবী) ওনার পছন্দমত খাবার রেঁধে খাওয়াতেন। কোনদিন বিশেষ কিছু খেতে ইচ্ছে হলে, ভাইপোদের কাউকে ডেকে বলতেন, যা মাকে প্রণাম করে পায়ের ধূলো মাথায় নে। দেখবি মা এক্ষুনি লুচি (বা অন্য কিছু) ভেজে খাওয়াবে। ছেলের মুখে তার জেঠুর কথা শুনে বৌমা তক্ষুনি তা করে দিতেন। কিন্তু পরে ঘরে ভক্ত সঙ্গে কথামৃত পাঠ শুরু হ'লে রাত্রে অধিকক্ষণ পর্যন্ত (ন'টা সাড়ে ন'টা) পাঠ ও আলোচনা হত। ফলে খেতে দেরী হয়ে যেত। ভাত বেড়ে রেখে দেওয়া হত। খাবার সময় তা ঠাণ্ডা হয়ে পিঁপড়ে ধরে যেত। কয়েকদিন পরপর ঐ ঘটনা লক্ষ্য করে বাড়ীর লোকেদের অসুবিধা হচ্ছে ভেবে রাত্রে খাওয়াই তুলে দিলেন। শুধু এক গ্লাস জল খেয়ে শুয়ে পড়তেন।

চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের পর এক সময় তাঁর ঘরে প্রতি শনিবার রামনাম গান হত। মনোজবাবু গাইতেন শেষের দিকে সকলে সমস্বরে গাইলে সে এক অপূর্ব দিব্য পরিবেশ সৃষ্টি হত। সকলের কণ্ঠ ছাপিয়ে শোনা যেত এক অজানা শিশুর সুরেলা কণ্ঠ। কিন্তু এই গান নিয়ে ভাইয়ের সংগে কথা কাটাকাটি হত। ভাইয়ের বক্তব্য ছিল এতে ছেলেদের লেখাপড়ার ক্ষতি হচ্ছে। কিছুদিন পর অবশ্য তিনি নিজে থেকেই ঘরে গান-বাজনা বন্ধ করে দেন, অবশ্য তা অন্য কারণে। তিনি উপলব্ধি করলেন গানও একপ্রকার সাত্ত্বিক ভোগ।*

*শ্রীরামকৃষ্ণ ভাবাবস্থায় বললেন, 'মা, গান কেন শুনব? গান শুনলে মন যে খানিকটা নেমে যায়'— কথামৃত।

তখন তাঁর ঘরে নিত্য ৭০/৮০ জন লোক আসত। একদল যায় তো আর একদল আসে। সারাদিনই ঘর ভর্তি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা কথামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা শোনে। তাদের অনেকে গলি রাস্তার ওপাশে সরু ড্রেনে প্রস্রাব করত। ড্রেন সংলগ্ন বাড়ীর মালিক শ্যামাপদ রায় তাদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালাগালি দিতেন। পাঁচীরের বাইরের দেওয়ালে ঘুঁটে দেওয়াতেন। তা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতো। আবার ইচ্ছা করে এমন জায়গায় উনুন ধরাতে দিতেন যাতে কয়লার ধোঁয়া ঢোকে শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরে। একদিন বিকালে উনুনের ধোঁয়ায় ঘর ভর্তি হয়ে গেলে সব লোকের কষ্ট হচ্ছে দেখে শ্রীজীবনকৃষ্ণ অস্থির হয়ে উঠলেন। নিজেই উঠে গিয়ে রায়মশাইকে দু'চার কথা বলতেই ভদ্রলোক হঠাৎ ছুটে এসে ওনার বাঁহাতের বুড়ো আঙুল মচ্‌কে দিলেন। পরক্ষণে ভয় পেয়ে ছুটে পালালেন। ওনার নামে থানায় ডায়েরী করা হল। এদিকে শ্রীজীবনকৃষ্ণের শ্রীতনু স্পর্শ করার ফলে তার কুণ্ডলিনী জাগরণ শুরু হল। স্বপ্নে ও জাগ্রত অবস্থায় কুণ্ডলিনীর প্রতীক সর্প দর্শন হতে লাগল। যোগ সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ হওয়ায় তিনি এতে রীতিমত আতংকিত হয়ে পড়লেন। কয়েকদিন পর এক সকালে ভদ্রলোক গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে এলেন বারান্দায় পায়চারিরত শ্রীজীবনকৃষ্ণের দিকে। তার কাঁচুমাচু ভাব দেখে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বুঝতে পারলেন যে রায়বাবু ক্ষমা চাইতে আসছেন। অমনি হাত নেড়ে নেড়ে জোরে জোরে বলতে লাগলেন— আমি কাউকে ক্ষমা করতে পারব না, আমি কাউকে ক্ষমা করতে পারব না। রায়বাবু ছুটে এসে ওনার পা জড়িয়ে ধরে কাঁদতে লাগলেন, বললেন— জগাই মাধাই উদ্ধার হয়েছিল আর আমি কি উদ্ধার পাব না? অমনি পট পরিবর্তন। বললেন, দ্যাখো দেখি, বুড়ো মিনসে আবার কাঁদে। না, না, আপনার স্থান ওখানে নয়, আপনার স্থান আমার বুকে। এই বলে তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। তারপর বললেন, আমিই জগাই, আমিই মাধাই, কাকে উদ্ধার করব? এরপর থেকে রায়বাবু যতদিন বেঁচে ছিলেন প্রতিদিনই শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরে এসে চুপ করে এক কোণে বসে পাঠ শুনতেন। ধন্য রায়বাবু! শতশত সাষ্টাঙ্গ প্রণাম আমাদের।

বৌদ্ধযুগে পরমভক্ত অঙ্গুরীমালের প্রথম জীবনে পথচারী নিরীহ মানুষকে হত্যা করে বুড়ো আঙুল কেটে নিয়ে মাল্যধারণের প্রবৃত্তির সংস্কার ফুটল রায়বাবুর মধ্যে, অপর পক্ষে শ্রীবুদ্ধের লোকতারণের মহতী ইচ্ছা বাস্তব রূপ নিল শ্রীজীবনকৃষ্ণের মধ্যে। তিনি স্থাপন করলেন নতুন দৃষ্টান্ত— 'বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্' নয় দুষ্কৃতির প্রবৃত্তি নাশ করে ক্ষুদ্র জীবকে শিবত্ব দানের অভিনব লীলা।

অবসর গ্রহণের পর পি. এফের টাকাটাই যা পেয়েছিলেন, পেনশন পান নি। নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা না করে ওনার জমা টাকা থেকে মানিকবাবুর তিন মেয়ের বিয়েতে ও ব্যাতাইতলায় বাড়ী করার জন্য জমি কিনতে মোটা অঙ্কের টাকা দিয়েছিলেন। তবুও ভাইয়ের সংসারে থেকে মাঝে মাঝে মানসিক আঘাত পেতেন।

একবার তখন উনি খুব অসুস্থ, এক অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ অনুরাগীকে বললেন, ওরে আমাকে এখান থেকে নিয়ে পালা। অন্য কোথাও আমার ব্যবস্থা করে দে বাবা। নয়তো আমাকে তোর কাছে নিয়ে চল্। ভক্তটি তাড়াতাড়ি হাতজোড় করে বললেন, আমাকে মাপ করবেন আমি তা পারব না।

এই মানসিক আঘাত সহ্য করার জন্য তিনি গভীর ধ্যান-সমাধিতে ডুব দিতেন। ব্রহ্মবিদ্যা ছিল তার করতলগত।

নানা প্রকার কুণ্ডলিনী জাগরণ (মীনবৎ, পিপীলিকাবৎ, কপিবৎ, পক্ষীবৎ ইত্যাদি, কথামৃত ৩/৫/১) মুহুর্মুহু সমাধি ও যোগের নানা অবস্থা যেমন অর্ধবাহ্যদশা, সচ্চিদানন্দ অবস্থা, নাদভেদ ও দেহ আত্মা পৃথক হওয়ার লক্ষণসমূহ স্মরণমাত্র, শ্রবণমাত্র তাঁর বরতনুতে প্রকাশ পেত। জগৎ সবিস্ময়ে দেখল তাঁর দিব্যদেহে যোগের নজিরবিহীন প্রদর্শনী (Demonstration)। তাঁর দেহ ছিল এতই পবিত্র যে 'কাম' কথাটা উচ্চারণ করা মাত্র সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। ঐ শব্দ উচ্চারণে দেহে যে মালিন্য সৃষ্টি হত সমাধির ফলে তা দূরীভূত হয়ে দেহের পবিত্রতা রক্ষা পেত। একে বলে প্রত্যাহার সমাধি। ব্রহ্মবিদের দেহ যেন সোনা যাচাই করার কষ্টিপাথর। শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহটি হয়ে উঠল সারা জগতের আধ্যাত্মিকতার মাপকাঠি। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন—

গুরু, বাবা, কর্তা— এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে, যন্ত্রণা হয়। দেহের মধ্যে সজাগ ভগবান কাঁটা বিঁধিয়ে জানিয়ে দেন— না, না, ওসব নয়। ওসব কথা গ্রহণ করে না, ঝেড়ে ফেলে দেয়। গ্রহণ করলে দেবত্বের হানি হয়। তাই প্রত্যাহার।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ 'টাকা মাটি, মাটি টাকা'— বলে গঙ্গায় একটা টাকা ফেলে কাঞ্চন ত্যাগ করেছিলেন। তিনি এরপর থেকে আর কাঞ্চন স্পর্শ করতে পারতেন না। শ্রীজীবনকৃষ্ণ পারস্য উপসাগর হয়ে ইংল্যাণ্ড যাবার পথে জাহাজের ডেকে দাঁড়িয়ে ইউফ্রেটিস নদীর মোহনায় দশ টাকার একটি নোট জলে ফেলে দিয়েছিলেন কাঞ্চন ত্যাগের কামনা নিয়ে। পরবর্তীকালে তিনি অবশ্য টাকা ছুঁতে পারতেন। তবে একদিন (কালী ব্যানার্জী লেনে থাকার সময়) বাজার করার জন্য বালিশের তলা থেকে টাকা বের করতে গিয়ে হঠাৎ কী রকম যেন কষ্ট অনুভব করলেন, বুঝলেন টাকা ছুঁতে পারছেন না। এমন সময় ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের কণ্ঠে দৈববাণী হল, 'না নিলে কষ্ট হবে'। তখন জোর করে হাত ঢুকিয়ে টাকা নিলেন।

সাধুর অন্যতম লক্ষণ অপরিগ্রহ। অপরিগ্রহ মানে অপরের দান গ্রহণ না করা। ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোড়ার গাড়ী করে ভক্তদের বাড়ী যাচ্ছেন। ভক্তরা গাড়ী ভাড়া দিয়ে দিচ্ছে। পরোক্ষভাবে তা ঠাকুরেরই গ্রহণ করা হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু অপরিগ্রহের মূর্তরূপ শ্রীজীবনকৃষ্ণের বরতনুখানি ছিল এতই সূক্ষ্মসংবেদনশীল যে পরোক্ষভাবেও কাঞ্চন গ্রহণের পরিবেশ সৃষ্টি হলে দেহেতে তীব্র প্রতিক্রিয়া হত। ফলে বজায় থাকত তাঁর অপরিগ্রহ। উনি যখন শ্রীরামপুরে রবি গাঙ্গুলীর বাড়ীতে (১৩-ডি, এন. এল. ভট্টাচার্য রোড, কয়েকজন ভক্তকে নিয়ে মেস করে থাকতে লাগলেন, তখন রবিবার ও অন্যান্য ছুটির দিন কলকাতা ও আশপাশ থেকে চাকুরীজীবী অনেক ভক্ত তাঁর সংগে দেখা করতে যেত। অনেকে সেখানে একবেলা খেত। এক রবিবার ভক্ত সেবার উদ্দেশ্যে বিমলবাবু (সরকার) বলে একজন ২০৲ টাকা দিয়েছিল মেস ফাণ্ডে। একথা উনি জানতেন না। পরদিন সকালে হঠাৎ গম্ভীর কণ্ঠে রঘুনাথবাবুকে (যিনি খরচের হিসাব রাখতেন) ডেকে হিসাবের খাতা দেখতে চাইলেন। খাতা দেখে

উত্তেজিত হয়ে বললেন, একটা মিল খেয়ে এত টাকা দিয়েছে কেন? দয়া করেছে নাকি? লোকের দানের অন্নে আমাকে বাঁচতে হবে? তোরা আমায় পতিত করলি? রঘুনাথবাবু কাতরকণ্ঠে হাতজোড় করে বললেন— ক্ষমা করুন। উনি বললেন, তোরা শুধু একটা কথাই শিখে রেখেছিস— ক্ষমা করুন আর ক্ষমা করুন। এভাবে আর নয়। মেস তুলে দে। রবিবাবুকে দুই মাসের বাড়িভাড়া দিতে গেলে উনি তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, তুই ভাড়া না নিয়ে আমায় পতিত করবি বাবা? তখন রবিবাবু করজোড়ে ক্ষমা চেয়ে নিয়ে ভাড়ার টাকায় ওনার লেখা ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থ কিনে নেন। উনি ফিরে এলেন কদমতলায়। এই অভিজ্ঞতা থেকে অনুরাগীরা বুঝেছেন কেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ মঠ আশ্রম গড়ে তুলতে বার বার নিষেধ করেছেন, কেননা মঠ করলেই অপরের দান গ্রহণ করতে হবে আর তাহলেই আত্মিক গতি রুদ্ধ হয়ে যাবে।

শুধু তাই নয়, যারা চালাকি করে অন্যের ধন আত্মস্যাৎ করে, ঘনিষ্ঠ আত্মীয় হলেও তাদের সঙ্গ বর্জন করতেন। হাওড়ার লক্ষ্মণ দাস লেনে থাকার সময় মানিক বাবুর ছোট ভগ্নিপতি নিজেকে দেউলিয়া ঘোষণা করে সপরিবারে এসে উঠলেন মানিকবাবুর বাড়ীতে। দেউলিয়া খাতায় নাম লেখানো মানে অপরের কাছে ঋণ নিয়ে আত্মস্যাৎ করে তা শোধ না দেবার আইনী রক্ষাকবচ গ্রহণ। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভাইকে বললেন দ্যাখ্, তুই যদি ওদের এখানে রাখিস তাহলে আমি এখান থেকে চললুম। মানিকবাবু বোন ভগ্নিপতিকে সঙ্গে সঙ্গে তাড়াতে পারলেন না। উনিই বাড়ী ছেড়ে চলে গেলেন, উঠলেন এক হোটেলে। পরে ওরা মানিকবাবুর বাড়ী ছেড়ে চলে গেলে উনি ফিরে এলেন ভাইয়ের কাছে।

উর্ধ্বমুখী মনকে সহস্রার থেকে নামিয়ে আনার জন্য জাগতিক বিষয়ের অবতারণার প্রয়োজন হত। তাই দীর্ঘক্ষণ উচ্চস্তরের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হতে হতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ হঠাৎ করে বলতে শুরু করতেন সেদিন কী কী তরকারী দিয়ে ভাত খাবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি নস্যি নিতেন। অন্য কোন প্রকার নেশা তাঁর ছিল না। একবার ডাক্তারের পরামর্শে কিছুদিনের জন্য নস্যি নেওয়া ত্যাগ

করেছিলেন। একদিন হল কী— মন এমন চড়ে গেল যে কিছুতেই স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরতে পারছেন না। হঠাৎ নজর পড়ল নস্যির কৌটার দিকে। একটিপ নস্যি নিতেই অনুভব করলেন মন যেন কিছুটা নেমে এল, স্বাভাবিকতা ফিরে পেলেন। বললেন, দূর! আমি যে কেন নস্যি নিই তা ডাক্তার ব্যাটা বুঝবে কী করে? সেই থেকে আবার নস্যি নিতে শুরু করলেন।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহের গঠন এমন ছিল যে মেয়েছেলে কাছে এলে চোখে জাল পড়ে যেত। ঝাপসা দেখতেন অথবা সমাধিস্থ হয়ে যেতেন যার তুলনা মেলে শ্রীরামকৃষ্ণ ও মহাপ্রভুর জীবনে। শ্রীরামকৃষ্ণ বলতেন— মেয়ে মানুষ ছুঁলে আমার গায়ে সিঙ্গি মাছের কাঁটা বেঁধার মত যন্ত্রণা হয়। মায়েরা আমাকে অমনি প্রণাম ক'রো (অর্থাৎ দূর থেকে)। নীলাচলে একদিন মহাপ্রভু সেবক গোবিন্দের সঙ্গে পথ চলছেন কৃষ্ণপ্রেমে বিভোর হয়ে। হঠাৎ দূরাগত কোন দেবদাসীর মধুর কণ্ঠের পদাবলীর সুর ঝংকারে তিনি আপনহারা হয়ে ঐ স্বর অনুসরণ করে ছুটতে থাকেন। তখন গোবিন্দ তাঁকে ধরে ফেলে জানালেন যে, ও কৃষ্ণের বাঁশরীর আহ্বান ধ্বনি নয়, ও রমণীর কণ্ঠস্বর। প্রভুর বাহ্যজ্ঞান ফিরে এল। সমস্ত অবগত হয়ে গোবিন্দকে বললেন— তুমি আজ আমার প্রাণরক্ষা করলে অন্যথায় নারীস্পর্শে আমার দেহ থাকত না। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর ভায়ের ছোট মেয়েটির সংগে কথা বলতেন, সে চা-টা দিয়ে যেত।একরাত্রে স্বপ্নে দেখলেন— শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁকে বলছেন, 'তুই মেয়েদের সংগে কথা কস!' উনি ঘুম ভাঙতেই বুঝতে পারলেন মেয়েটি নিশ্চয়ই আট পেরিয়ে ন'য়ে পা দিয়েছে। আর ওর সংগে কথা বলা যাবে না। তবু ঠাকুরের দিকে মুখ করে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অনুযোগের সুরে বললেন, বয়েই গেছে আমার তোমার কথা শুনতে। আমাকে চা এনে দেবে কে? দৈবের কৃপায়, এই সময় থেকেই বাড়ীতে বহাল হল এক হিন্দুস্তানী চাকর। ফলে তাঁর কোন অসুবিধা হল না।

একবার, তখন শীতকাল, এক ভদ্রলোক তার নয় দশ বছরের মেয়েকে সঙ্গে নিয়ে এসেছেন। দুজনে ঘরের এককোণে চুপচাপ বসেছেন। কিছুক্ষণ পর ঐ শীতেও শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘামতে লাগলেন। চাদর খুলে ফেললেন,

তারপর জামা খুলে ফেললেন। অরুণবাবু কারণটা বুঝতে পেরে হাত ইসারা করে রামবাবু মারফৎ ঐ ভদ্রলোককে চলে যেতে বললেন। ভদ্রলোক উঠলেন। মেয়েটি দরজার কাছে এসে হাতজোড় করে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে প্রণাম জানালো। উনি কেঁপে কেঁপে উঠলেন আর বুকের কাছে হাত দুটি জোড় করে বললেন, 'অপরাধ নিসনি মা, অপরাধ নিসনি। কি করবো মা, ঠাকুর আমায় এই অবস্থায় রেখেছেন।' আবার ওরা চলে যেতেই অন্য মুর্তি ধরলেন। গম্ভীর গলায় বললেন, 'এসব কি আমার জন্য নাকি? ওরে এসব তোদের জন্য।'

উনি বলতেন, 'মায়েদের যদি এখানে আসতে দিই তাহলে তোদের (পুরুষদের) আর এখানে ঠাঁই হবে না। মায়েদের ভক্তি বেশি। ওরাই সর্বদা এখানে পড়ে থাকবে। তোদের সংসার যে অচল হবে।' এক ভক্ত তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন— মায়েরা তো পরে আপনার বিরুদ্ধে অনুযোগ করবে। তিনি এর উত্তরে বলেছিলেন— 'দ্যাখ, মায়েরা পরে বুঝতে পারবে যে আমার মত মঙ্গলাকাঙ্খী তাদের আর কেউ নেই।' বাস্তবিক তাঁকে নিয়ে দর্শন-অনুভূতি পুরুষদের তুলনায় নারীদেরই বেশি।

সন্ন্যাসী নারীর অন্তরে থাকবে— দুই অর্থেই শ্রীরামকৃষ্ণের এই বাণী তাঁর জীবনে মূর্ত হয়েছিল। অন্তরে মানে তফাতে, আবার অন্তরে মানে ভিতরে। তিনি বাইরে নারীদের থেকে তফাতে থাকতেন আর ঠাঁই নিতেন তাদের দেহের ভিতরে চিন্ময় রূপ ধরে। তিনি যে সন্ন্যাসী।

তিনি কখনও কোন মানুষ গুরুর আশ্রয় নেন নি। মন্ত্রের উপর ছিল তাঁর সহজাত অনীহা। স্বপ্নে শ্রীরামকৃষ্ণদেব তাঁকে মন্ত্রদান করেছিলেন কিন্তু স্বপ্ন ভাঙলে পাশ ফিরে শুলেন। মনে মনে ঠাকুরকে বললেন, ঠাকুর আমি মন্ত্র জপতে পারব না। মন্ত্র জপার জন্য তুমি অন্য লোক দ্যাখো। তুমি যেমন আমায় নিত্য দেখা দাও সেইভাবেই দেখা দিও। একবার কথকতা শুনতে গিয়েছিলেন। কথক ঠাকুরকে ক্রমাগত প্রশ্ন করায় সে বেচারা শেষ পর্যন্ত বলল, আমাদের এ পেশাদারী ব্যাপার। আপনি যা প্রশ্ন করছেন ওসব আমরা বুঝি না। তখন ওনার মনে হ'ল সত্যিই তো!

জীবনে কখনও দুর্গার ভাসান দেখতে যাননি, এমনকি ঠাকুর দেখতেও যাননি। কী অদ্ভুত দৈব!

যে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ ছাড়া আর কিছু তিনি জানতেন না তাঁর পায়ে একটা ফুলও কখনও অর্পণ করেন নি। ভোগরাগ তো দূরের কথা। বাজার থেকে কখনও কখনও মালা কিনে এনে ঠাকুরের ছবিতে দিতে গেছেন কিন্তু কিছুতেই পারেন নি, সমাধিস্থ হয়ে গেছেন। বাড়ীতে কোন ভক্ত এলে তাকে দিয়ে ঐ মালাটা ঠাকুরের ছবিতে পরিয়ে দিয়েছেন। জীবনে কখনও পূজা অর্চনা করেন নি। একটা মন্ত্রও জানা ছিল না তাঁর। পরবর্তীকালে বলতেন, এখন বুঝি যে পূজা করতে পারলে ঠাকুরের কৃপা কিছুই বুঝতে পারতাম না। একদিন ধূপ নিয়ে ঠাকুরের পটে আরতি করতে করতে দর্শন হল— মস্ত এক বন। বনটি খুব বড় একটা নদীর ধারে। নদীর ওপারেই মস্ত বড় মন্দির। তিনি সেই নদীতে স্নান করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে এলেন। সেই মন্দিরের মধ্যে এক কালীমূর্তি। সেই মূর্তির আরতি করতে লাগলেন। খুব আনন্দ হতে লাগল। পরদিন সকালে উঠে মনে হল, আরে পুজোর আনন্দও তো সাত্ত্বিক ভোগ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ কেঁদে মাটিতে মুখ ঘসড়াতেন আর বলতেন, মা রামপ্রসাদকে দেখা দিয়েছিলি আর আমাকে দেখা দিবি নে? কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণ জানতেন না যে ভগবানকে দেখা যায়। তাঁকে দেখার জন্য কাঁদতে হয়। সাধারণ মানুষের মতোই দৈনন্দিন জীবনযাপন করতেন, আর বিছানায় শুয়ে শুয়ে দেখতেন আপনা হতেই তাঁর দেহে ক্রমান্বয়ে হয়ে চলেছে বেদের সাধন, বেদান্তের সাধন, ব্রহ্মজ্ঞানের অনুভূতি, তত্ত্বজ্ঞান, চৈতন্য সাক্ষাৎকার, মানুষরতন দর্শন তথা অবতারতত্ত্বের সাধন ইত্যাদি নিত্য নূতন অধ্যায়ের বৈচিত্র্যময় অনুভূতিসমূহ। তাই তো তিনি বলতেন— বাবা, ভগবানকে পেতে হলে কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন শুধু তাঁর কৃপা। সমস্যা কণ্টকিত যন্ত্রযুগের মানুষের কাছে তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন এক নূতন প্রেরণার উৎস।

বহু সাধকের বহু সাধনার ধারা ধেয়ানে যার মিলিত হয়েছিল সেই যুগাবতার শ্রীরামকৃষ্ণকে অন্তরে দর্শন করে তার সমস্ত সাধনার ফল লাভ

করেছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ মাত্র বারো বছর বয়সে। তারপর চোদ্দ বছর বয়সে দর্শন করলেন স্বামী বিবেকানন্দকে— দেহেতে মূর্ত হল রাজযোগ। পরবর্তীকালে যীশু, মহম্মদ, বুদ্ধ প্রভৃতি মহাপুরুষের আত্মিক অবস্থা প্রত্যক্ষ করেছেন। দেখেছেন মহামায়ার প্রতীক রূপে গ্রীক দেবী জুনোকে, দিনদুপুরে দেহ থেকে বেরিয়ে দেখা দিয়েছেন গীতার পার্থসারথি মূর্তি, দর্শন করেছেন তন্ত্রোক্ত দশ মহাবিদ্যার শেষ বিদ্যা কমলামূর্তি, কখনও দেখেছেন মন্দির থেকে শিব ঠাকুর বেরিয়ে এসে করমর্দন করে আবার মন্দিরে ঢুকে গেছেন, কখনও বা অন্তরে জেগেছে ভয়ঙ্করী চামুণ্ডামূর্তি, অট্টহাসিতে যিনি শত্রুনাশ করেন, সকল অশুভশক্তি নাশ করেন। এরূপ অজস্র বহুবিধ দর্শন অনুভূতিতে সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর জীবন।

দেহ থেকে বেরিয়ে শ্রীভগবান মানুষের মূর্তি ধরে কথা কয়ে যান এমন বহু উদাহরণ শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনে দেখতে পাই। শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনেও এরকম একটি অনুভূতি হয়েছিল কবীরকে নিয়ে।

একদিন উনি অফিস যাচ্ছেন ট্রামে করে। চলন্ত ট্রাম থেকে নেমে দু'এক পা ছুটে যেতেই, একজন পাঞ্জাবীর গায়ে ধাক্কা লাগল। তার বুক পর্যন্ত দাড়ি। কোট প্যান্ট পরে আছেন। লোকটা ওনাকে হাত তুলে নমস্কার করল। উনিও প্রতি নমস্কার করলেন। তারপরই সে কবীরের কথা তুলল। উনি বললেন, Let you come to my office which is not far off from here. অফিসে এসে ঝাড়া দু'ঘণ্টা থেকে আড়াই ঘণ্টা তার সাথে ঈশ্বরীয় কথা হ'ল, বিশেষত কবীরের কথা। অফিসের পিওন, দারোয়ান ইত্যাদিরা তখন যে যেদিকে পেরেছে সরে পড়েছে। ঘর খালি, ওনাদের আলোচনায় একটুও বাধা হ'ল না। তারপর সে চলে গেল। অন্যান্য লোক গেলে উনি চা-টা খাওয়াতেন কিন্তু এনাকে খাওয়ানোর কথা একবারও মনে উঠল না। চলে যাওয়ার পর হঠাৎ ফ্লাশ করল, তাই তো! ও যে কবীরই এসেছিল!

বীজ যেমন আলো, হাওয়া, মাটি, জল থেকে শক্তি সংগ্রহ করে

নিজের উদ্ভিদসত্তার বিকাশ ঘটায় তেমনিভাবে সকল ধর্মসাধনার সার আত্মস্যাৎ করে নিজস্ব সত্তার পূর্ণ বিকাশ ঘটল তাঁর।

তাঁর দেহে ব্যষ্টির সাধনের চরম উৎকর্ষতা সাধিত হলেও তিনি তা গ্রহণ করেন নি। এইভাবেই নেতি নেতি করে চলে এসেছিলেন তিনি। কিন্তু যেখানে তাঁকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছে সেটি হল, তাঁকে কেন্দ্র করে সমষ্টিগত সাধনের অভূতপূর্ব অধ্যায়। অবতারত্বকে অতিক্রম করে নূতন এই আত্মিক অবস্থায় তাঁর রূপ ফুটে উঠতে লাগল সর্বধর্মের সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরে। তাঁকে স্বপ্নে, ধ্যানে, তন্দ্রায় ও জাগ্রত অবস্থায় দেখতে লাগলেন আবালবৃদ্ধবনিতা।

এই সময়, চাকরী থেকে অবসর গ্রহণের এক বছর আগে, ১৯৫২ সালে তাঁর দর্শন হল— একটি অন্ধকার গুহায় হাত ভরে একজন মানুষকে মাথার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুললেন। মনে হল লোকটির নাম অনাথবন্ধু। সে হাতজোড় করে বলল, 'বাবুজী, মশাই আপনি জানবেন, আপনি ভগবান, তবে গুপ্তভাবে লীলা।' হ্যাঁ, বাইরে আর পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই, কিন্তু মানুষের দেহের ভিতরে গোপনে গোপনে চিন্ময়রূপ ধরে তাঁর লীলা প্রদর্শন শুরু হয়ে গেল।

তিনি কারও সাথে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করতেন না। সাহিত্য রাজনীতি খাওয়া-দাওয়া ব্যায়াম ইত্যাদি বিষয়ে বন্ধুদের সাথে কথা বলতেন। বন্ধুরা ধর্মকথা বললে শুনতেন মাত্র। ঘনিষ্ঠ কিছু বন্ধুর সাথে নির্জনে গিয়ে একসাথে ধ্যানও করতেন। ক্বচিৎ কখনও ভাবের বহির্প্রকাশ ঘটে যেত। পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিতেন। একবার ট্রামে চড়ে অফিস থেকে ফিরছেন। ট্রাফিক জ্যামে ট্রাম থেমে আছে। আকাশে মেঘ জমেছে দেখে ভাবস্থ হয়ে পাশে বসা ভদ্রলোককে বললেন, মান পালাটা ধরুন না! ভদ্রলোক কীর্তনীয়া ছিলেন। গান ধরলেন। পদটি শেষ হলে বললেন, আপনি কী করে বুঝলেন যে আমি কীর্তন জানি? তখন ওনার সম্বিৎ ফিরেছে। কথা না বাড়িয়ে 'এই এমনি'— বলে ট্রাম থেকে লাফিয়ে নেমে পড়লেন।

যাইহোক, তিনি প্রথম মুখ খুললেন তারাবাবু (ওনার ছাত্র তারাচরণ চট্টোপাধ্যায়) ও ফটিকবাবুর কাছে। নিজের দর্শন ও অনুভূতির কথা কিছু বললেন। পরদিন ভোরে ঘরের দরজা খুলতেই দেখেন ওরা দুজন দরজার সামনে বসে আছেন। জিজ্ঞাসা করায় জানা গেল দুজনেই সারারাত্রি ধরে ওনাকে নিয়ে অপূর্ব অপূর্ব সব দেবস্বপ্ন দেখেছেন।

ছেলেবেলায় স্বপ্নে ঠাকুর তাকে গোটা পৃথিবী ঘুরিয়ে এনেছিলেন এমনভাবে যে উত্তরকালে বই পড়ে ভূগোল শিখতে হয় নি। পৃথিবীর ম্যাপখানা স্পষ্টভাবে মনে গেঁথে গিয়েছিল। তিনি একবার দেখলেন— ঠাকুর তাঁর হাত ধরে বেরোলেন সেন্ট্রাল এশিয়া থেকে, তারপর ঘুরতে ঘুরতে বৈকাল, বলখাস হ্রদের পাশ দিয়ে ইরান, তুরান ঘুরে খাইবার গিরিপথ দিয়ে ভারতবর্ষে এনে হাজির করলেন। সামনে দেখলেন মস্ত এক মসজিদ। এক লাফে তার উপর উঠেছেন এমন সময়ে দেখেন তাঁর একটা পা ধরে তারাবাবু ঝুলে পড়ল আর স্বপ্নও ভেঙে গেল।

আর্যদের ভারতে আগমনের পথ ধরেই যেন তিনি এলেন। মসজিদ তথা ইসলাম ধর্ম অনুভূতিমূলক ধর্ম নয়, মূলত সামাজিক ধর্ম (Social Religion)। অনুভূতিমূলক ধর্ম তথা আর্যকৃষ্টির উৎপত্তি ও বিবর্তন শেষে সমষ্টিতে তার প্রকাশ ও প্রচলিত ধর্ম অর্থাৎ সামাজিক ধর্মের উপর এই সত্যধর্মের প্রতিষ্ঠা বাঙালীর দেহেতেই প্রথম ঘটবে সেকথারই যেন ইঙ্গিত ছিল এই স্বপ্নটিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ১৯১৮ সালে নারিটে শিক্ষকতার সময় ছাত্র তারাচারণ তাঁকে প্রথম মহাপুরুষ রূপে স্বপ্নে দর্শন করেছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায়, একটি চিঠি খুঁজে পেয়ে সেটি পড়ে নিয়ে চিঠির কথা অনুযায়ী কুটুম বাড়ীতে একটি কাপড় ও পাঁচ সের সন্দেশ পাঠানো শুরু হল। কুটুম বাড়ী— বসুধৈব কুটুম্বকম্। সন্দেশ— সংবাদ, ঈশ্বরীয় লীলার পরিচয়, আত্মিক অনুভূতিসমূহ। কাপড়— দেহ। তাঁর চিন্ময়শরীর পরিস্ফুট হতে লাগল সংখ্যাতীত মানুষের অন্তরে।

তাঁর অফিসের সহকর্মীরা কেউ বাদ যাননি। একে একে সকলেই

তাঁকে স্বপ্নে দেখেছেন বলে জানিয়েছেন। এছাড়া বিভিন্ন অঞ্চলের পরিচিত অপরিচিত অনেকে তাঁর কাছে এসে বলতে লাগলেন, আমি আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি, শ্রীরামকৃষ্ণদেব স্বপ্নে আপনার কাছে আসার নির্দেশ দিয়েছেন— ইত্যাদি। উনি প্রথম প্রথম গুরুত্ব দিতেন না। বলতেন, মশাই, ভাল করে খাওয়া দাওয়া করবেন। কিন্তু ক্রমে তাঁকে দেখা লোকের সংখ্যা বাড়তে লাগল এবং একই লোক বারবার তাঁকে দেখছেন বলে জানাতে লাগলেন। তিনি বুঝলেন, এ একটা নতুন কিছু হচ্ছে।

স্বপ্নদ্রষ্টাদের বললেন, শনিবার বিকালে ও রবিবার কয়েকজন বন্ধু মিলে বাড়ীতেই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ করি। ইচ্ছা হলে আসুন ২/১ নং কালী ব্যানার্জী লেনের বাড়ীতে। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাস থেকে বাড়ীতে নিয়মিত পাঠ শুরু হল। এই সমষ্টির ধর্মের আভাস ফুটেছিল এক বছর আগেই। তখন কিছুদিনের জন্য আলপুকুর থেকে ট্রেনে যাতায়াত করে অফিস করেছিলেন। একদিন একজনের সাথে ঈশ্বরীয় কথা একটু বলে থেমে গেলেন— তখন দেখেন কামরার সকলে একে অপরের সাথে ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ আলোচনা করছেন। ঘরে ভক্ত লোকের সমাগম ক্রমাগত বাড়তে থাকায় উনি ভাবলেন, তবে কী জীবনে প্রতিষ্ঠা আসছে? বৈষ্ণব শাস্ত্রে বলেছে, প্রতিষ্ঠা শূকরী বিষ্ঠা। তিনি চঞ্চল হয়ে উঠলেন। এদিকে ভায়ের সংসারে থেকে নানা অনাকাঙ্খিত পীড়ন সহ্য করতে হত। কখনও কখনও তা অসহ্য হয়ে উঠত। এইসব কারণে একদিন কাউকে কিছু না জানিয়ে চলে এলেন শিয়ালদার বেঙ্গল বোর্ডিং-এ, পরে মিডল্যান্ড হোটেলে। সন্ধ্যায় ধ্যান করতে বসতেন। কিছুদিন পর দেখলেন বোর্ডিং-এর সকলেই ঐ সময় ধ্যান করতে শুরু করেছেন। পরে এখানেও লোক যাতায়াত শুরু হল। বুঝলেন, শ্রীভগবান তাঁকে নিয়ে নতুন লীলা শুরু করেছেন। ফিরে এলেন কালী ব্যানার্জী লেনের বাড়ীতেই। ওনার অবসর গ্রহণের পর (১৯৫৩, ১৫ই জুন) উঠে এলেন কদমতলার বাড়ীতে। সেখানে প্রত্যহ সকাল থেকে রাত্রি ন'টা সাড়ে ন'টা পর্যন্ত কথামৃত পাঠ ও আলোচনা চলতে লাগল। মাঝে স্নান খাওয়ার সময়টুকু বাদ। একদিনের জন্যও তিনি আলস্য অনুভব করেন নি।

কথামৃত-অন্তপ্রাণ শ্রীজীবনকৃষ্ণ এক স্বপ্নে দেখেছিলেন একটা মস্ত বড় খাঁচা, জগৎজোড়া, তাতে বিরাট আকৃতির সব ব্রহ্মদৈত্য রয়েছে। উনি খাঁচার কাছে যেতেই ওরা কাকুতি মিনতি করে বলতে লাগল, আপনি আমাদের বেদ বেদান্ত পুরাণ তন্ত্র সব শোনান। উনি বললেন, আমি বেদ বেদান্ত পুরাণ-তন্ত্র জানি না। আমি এক কথামৃত পড়ি। ওর ভেতরেই সব আছে। তখন তারা বলল, তবে তাই শোনান, আমাদের কথামৃত-ই শোনান। ওরা সব আচার্যপুরুষ। ব্রহ্ম হতে এসেছিল কিন্তু শাস্ত্রের অপব্যাখ্যা করেছিল বলে ব্রহ্মদৈত্য হয়েছে অর্থাৎ মানুষের মাথায় ঐসব অপব্যাখ্যা সংস্কার রূপে থেকে গেছে যা তখন মুক্তির দিশা খুঁজছে। এই সংস্কার উচ্ছেদের একমাত্র উপায় হ'ল শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রদত্ত দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যাসহ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত শ্রবণ।

৪০-৪১ বছর বয়সে একটি বিশেষ স্বপ্নদর্শনের পর থেকে কথামৃত পড়তে পড়তে তার যৌগিক ব্যাখ্যা আপনা হতে জেগে উঠত তাঁর মাথায়। তাঁর শ্রীমুখ থেকে ঠাকুরের বাণীর সেইসব অশ্রুতপূর্ব দেহতত্ত্বের ব্যাখ্যা যে শুনত সেই মুগ্ধ হয়ে যেত। প্রচণ্ড গরমে মশার কামড় খেয়েও ঘণ্টার পর ঘণ্টা তারা বসে থাকত।

তিনি দেখেছিলেন— সুন্দর একটি বাগান। ভিতরে চমৎকার একটি বাড়ী। উঁচু ভিত। ঘরের মাঝে খাটের উপর তাকিয়া মাথায় শুয়ে আছেন এক বাবু। মুখটি ছাড়া সমস্তই সাদা চাদরে ঢাকা। মেঝেতে রাখা গড়গড়ার নলটি বাবুর মুখে লাগানো। দ্রষ্টা খাটের পাশে দাঁড়িয়ে, দৃষ্টি বাবুর শ্রীমুখে। একটু পরে ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় এলেন, সেখান থেকে নেমে বাগানের রাস্তা ধরে ফটকের দ্বারে এসে দাঁড়ালেন। দ্বার রুদ্ধ। সামনে জগতের রাস্তা। দ্বারে সারি সারি লোহার দণ্ড পোঁতা— মাথায় গোলচক্র। দ্রষ্টা একটি দণ্ড তুলে হাতে ধরে রইলেন। জগতের রাস্তার সঙ্গে বাগানের রাস্তা এক হয়ে গেল।

বাবু— শ্রীভগবান। জগতের সাধারণ মানুষের কাছে বাবুর বাগানে ঢোকার অর্থাৎ আত্মিক জগতে প্রবেশের দ্বার উন্মুক্ত হল।

তিনি কথামৃতের কথাটুকু ছেড়ে অমৃতটুকু আস্বাদনে সমর্থ হলেন এবং তা জগতের মানুষকে পান করাতে লাগলেন যোগাঙ্গের ব্যাখ্যা শুনিয়ে। এর আভাস ফুটে উঠেছিল ওনার ১৪ বছর বয়সের এক স্বপ্নে। তিনি দেখেছিলেন—

পাঁচতলা ঘোরানো সিঁড়ি। কথামৃত প্রণেতা মাস্টার মশায়ের হাত ধরে দ্রষ্টা পাঁচতলা সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনের বৃহৎ বারান্দায় পৌঁছালেন। মাস্টারমশাই অদৃশ্য হলেন। দ্রষ্টা বারান্দা দিয়ে একটি বৃহৎ ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরের শেষভাগে শ্রীরামকৃষ্ণ বসে আছেন। তিনি ঠাকুরের পাশে গিয়ে বসলেন। স্বপ্ন ভেঙে গেল।

এখানে মাস্টারমশাই শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃতের প্রতীক। কথামৃত পড়লে মন পাঁচতলা সিঁড়ি অর্থাৎ পঞ্চমভূমি পর্যন্ত উঠবে। বারান্দা— ষষ্ঠভূমি। বৃহৎ ঘর— সহস্রার। ঠাকুর— ভগবান। কাছে গিয়ে বসলেন অর্থাৎ এক হয়ে গেলেন। ভবিষ্যতে দর্শন ও অনুভূতির আলোয় শব্দার্থ অতিক্রম করে মর্মার্থ তথা শ্রীভগবানের সম্যক পরিচয় হৃদয়ঙ্গম করবেন— তারই ইঙ্গিত ছিল স্বপ্নটিতে। তিনি কথামৃতে উল্লিখিত ঠাকুরের প্রায় সকল বাণীর মর্মার্থ জগতে প্রকাশ করেছেন। এমনকি আপাত দৃষ্টিতে যা হাল্‌কা কথা তারও যে দেহতত্ত্বে গভীর অর্থ আছে সেকথা ধরিয়ে দিয়েছেন।

যেমন, ঠাকুর হঠাৎ সিদ্ধের উপমা দিলেন— গরীবের ছেলে বড় মানুষের নজরে পড়ে গেছে। বাবু তাকে মেয়ে বিয়ে দিলে, সেই সঙ্গে বাড়ী-ঘর-গাড়ী-দাসদাসী সব হয়ে গেল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ব্যাখ্যা দিলেন, বাবু— শ্রীভগবান সাকারে। মেয়ে বিয়ে দেওয়া— দেহের মধ্যে থেকে জেগে ওঠা ভগবৎ সত্তা দিয়ে গড়া ভাগবতীতনু বা কারণশরীর। তিনি স্ত্রী অর্থাৎ জীবনসঙ্গিনী হল, কেননা সারা জীবন ধরে এই কারণ শরীরেই বহুবিধ ঈশ্বরীয় লীলা দর্শন হয়। বাড়ী— দেহ, সাততলা বাড়ী। ঘর— প্রতিভূমির অনুভূতি। গাড়ী— গতি, কুণ্ডলিনীর ঊর্ধ্বগতি লাভ। দাস— ইন্দ্রিয়গণ দাস হয়। দাসী— মায়া দাসী হয় অর্থাৎ দেহের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আসে।

ঠাকুর বলেছেন— বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বীচি। উনি ব্যাখ্যায় বললেন, দেহের ভিতর আত্মা। আত্মার মধ্যে জগৎ তথা বিশ্বরূপ দর্শন হয়। তারপর বিশ্ববীজবৎ অনুভূতি হলে উপলব্ধি হয় বিরাট জগৎ বীজরূপে, অণুরূপে মানুষের ভিতরেই রয়েছে।

আবার ঠাকুর যখন বলছেন, 'ঝাঁটা নিজে অস্পৃশ্য বটে কিন্তু স্থানকে শুদ্ধ করে'— এর অর্থ করলেন এইভাবে যে ঝাঁটা মানে আত্মা। সহস্রারে অঙ্গুষ্ঠবৎ আত্মা দর্শন হয় পরে তা ধান্যশীর্ষবৎ বা ধূমকেতুর লেজের মত অর্থাৎ ঝাঁটার আকৃতি ধারণ করে। অস্পৃশ্য কেন? না, এই আত্মাকে ধরা ছোঁয়া যায় না। তিনি কৃপা করে প্রকাশ পান। স্থান— মানবদেহ ছাড়া আত্মার পূর্ণ প্রকাশ কোথাও হয় না। দেহে আত্মা প্রকাশ পেলে দেহ শুদ্ধ হয়, গঙ্গা স্নানে নয়।

কথামৃতের এই জাতীয় মর্মার্থ শ্রবণে শ্রোতাদের আত্মিক জগতের রুদ্ধদুয়ার খুলে গিয়ে অজস্র দর্শন অনুভূতিতে জীবন সমৃদ্ধ হতে লাগল।

১৯৪২ সালে তিনি একদিন স্বপ্নে দেখলেন— তাঁর বিছানার ঠিক ডবল বিছানা। সাদা ধবধবে চাদর পাতা। তার ওপর চার পাঁচ ফোঁটা মধু পড়ে গেল। বিছানাটা নষ্ট হবে, তাই হাত দিয়ে মুছে ফেলতে গেলেন। কিন্তু মুছতে গিয়ে বেড়ে বেড়ে যেন সারা বিছানাটা মধুতে আপ্লুত হয়ে গেল।

মধু চৈতন্যের প্রতীক। স্বপ্নে ঐ যে অনেকক্ষণ ধরে হাত দিয়ে মধু মুছতে লাগলেন তার অর্থ অনুশীলন। ঐ বড় সাদা ধবধবে চাদরটি হল জগৎ। অনুশীলনের মাধ্যমে তাঁর চৈতন্যের দ্বারা জগৎ আপ্লুত হবে— তাঁর বিশ্বব্যাপীত্ব লাভ হবে।

অনুশীলন চলতে লাগল নিরবচ্ছিন্নভাবে। পাঠ— পাঠ আর পাঠ। সঙ্গে দেহতত্ত্বের যৌগিক রূপের ব্যাখ্যা। ১৯৪৯ সালে একদিন স্বপ্ন দেখলেন— ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের বায়বীয় শরীর। বাতাসের ওপর রেখাপাত মাত্র। তিনি বলছেন, আমায় শুনিয়ে খাইয়েছিস। দ্রষ্টার মনে হল ঠাকুর এবার লিখে খাওয়াতে বলছেন। ব্যাজার হয়ে চেঁচিয়ে বললেন, দলিল কোথায়? ঠাকুর চার

গুণ জোরে চেঁচিয়ে বললেন, ঐ মহিন্দর মাস্টারের কাছে। আর আঙুল দিয়ে দুরে মাস্টার মশাইকে দেখিয়ে দিলেন। স্বপ্ন ভাঙল। সেদিন তাঁর ঘরে উপস্থিত সকলেরই ঐ দর্শনের স্বপক্ষে (১৩ জন ভক্তের) স্বপ্ন হলে তিনি লিখলেন 'ধর্ম ও অনুভূতি' নামে ২খণ্ডে সম্পূর্ণ একটি গ্রন্থ। লেখক হিসাবে নিজের নাম দিলেন 'কুড়িয়ে পাওয়া মানিক।' মহাপুরুষের নিজের হাতে লেখা অনুভূতিসমৃদ্ধ এক ব্যতিক্রমী ধর্মগ্রন্থ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বললেন, ঐ একটা আলো আসছে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু কোন দিক থেকে আসছে বুঝতে পারছি না। ঐ আলো মণির আলো। শ্রীজীবনকৃষ্ণ এই মানিক কুড়িয়ে পেয়েছিলেন অর্থাৎ আপনা হতে তাঁর দেহে প্রকাশ পেয়েছিল আত্মা— সাত রাজার ধন এক মানিক। মানিক কুড়িয়ে পাবার কথা মানিক নিজেই জানিয়ে দিল অন্য বহুজনকে তাদের দর্শন অনুভূতিতে। সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত হল মানবব্রহ্মের পরিচয়। দেখতে দেখতে ঘর ভরে গেল। ভক্ত সমাগমে পূর্ণ ঘরখানিতে বসার জায়গার অভাব, তাই যতজনকে সম্ভব ডেকে তুলতেন তাঁর খাটে। দীর্ঘক্ষণ হাঁটুমুড়ে বসে থাকতে হত তাঁকে। রাত্রিবেলা সকলে চলে গেলে ক্লান্ত, অবসন্ন, ব্যাথায় আড়ষ্ট দেহটাকে কোন রকমে খাট থেকে নামিয়ে মেঝেতে বসতেন। পা সোজা করতেও কষ্ট হত। বলতেন— দ্যাখ, দেহটা পাথরের হলে ফেটে যেত। নেহাত রক্তমাংসের তাই বেঁচে আছি। গলার স্বরও ভেঙে যেত বকে বকে। কথা বলতেও কষ্ট হত। তবুও বলতেন— বাবা, যতক্ষণ আমার গলা দিয়ে স্বর বেরোবে আমি বলে যাব—মানুষ ব্রহ্ম, মানুষ ব্রহ্ম, মানুষ ব্রহ্ম। তারপর বিছানার চাদরটা ঝেড়ে নিয়ে সকলের পদধূলি লাঞ্ছিত ঐ বিছানায় শুয়ে পড়তেন।

নতুন কেউ এসে তাঁকে প্রণাম নিবেদন করতে গেলে তিনি বলতেন, বাবা, আমাকে প্রণাম করছ কেন? ভগবানকে চাও বলে তো? ভগবান যে তোমার দেহে। ওহি রাম সব্‌সে নিয়ারা। কাতর হয়ে ডাক— কেঁদে বল, হে ভগবান, তুমি আমার ভেতরে রয়েছ দেখা দাও। জীবনের আরও একটা দিন কেটে গেল। তিনি রূপধারণ করে ফুটে উঠে বলে দেবেন— জানিয়ে দেবেন

তিনি কে, তিনি কেমন। ব্যাস, শুরু হয়ে যেত তাঁকে স্বপ্নে দেখা। তিনি বলতেন, তোরা যে আমায় স্বপ্নে দেখিস সে কি আমি? না রে সে ভগবান।

কথামৃতে আছে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব শ্রীমকে বলেছিলেন— স্বপ্নে যদি আমাকে ধর্ম উপদেশ দিতে দেখ জানবে সে সচ্চিদানন্দ। মানুষ কখনও গুরু হতে পারে না, সচ্চিদানন্দই গুরু। মানুষগুরু প্রথা উচ্ছেদ করে সচ্চিদানন্দগুরু প্রথা প্রবর্তন করলেন ঠাকুর। আর তা ব্যাপকভাবে চালু হল শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে।

তাঁর ঘরে ফল ফুল মিষ্টি ইত্যাদি কোন প্রকার উপহার আনার কোন উপায় ছিল না। কিন্তু প্রতিদিনই বহু মানুষ এসে নিবেদন করত তাদের বহু বিচিত্র দর্শন অনুভূতির কথা। এক ভক্ত (নগেনবাবু) স্বপ্ন দেখলেন— তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণকে সাষ্টাঙ্গ দিয়ে প্রণাম করলেন। উনি বললেন, গুরুকে কিছু দিতে হয়। ... দ্রষ্টা পরদিন সেই স্বপ্ন শ্রীজীবনকৃষ্ণকে নিবেদন করে বললেন, আপনার জন্য সন্দেশ কিনতে যাচ্ছিলাম, তারপর মনে হল আপনি যদি রাগ করেন, তাই কিছু আনিনি। এখন বলুন কী আনব আপনার জন্য? উনি বললেন, দেখুন নগেনবাবু, সন্দেশ রাবড়ি নয়, গুরুকে দেহ দান করতে হয়। আপনার দেহটি শ্রীভগবানের লীলার জন্য দান করুন। প্রতিদিন এখানে এসে পাঠ শুনুন তাহলেই হবে।

ভোলাবাবু (মুখোপাধ্যায়) দেখলেন জীবনকৃষ্ণের ঘরে কোন কিছুই আনার উপায় নেই। তাই অনেক ভেবে একদিন এক প্যাকেট সুগন্ধি ধূপকাটি নিয়ে গিয়ে তার ঘরে দুটি কাঠি জ্বেলে দিলেন। জীবনকৃষ্ণ আপত্তি করলেন না। পরে ঘরে নতুন কেউ ঢুকলেই বলছেন, ''খুব মিষ্টি একটা গন্ধ পাচ্ছিস? ভোলা এই সুগন্ধি ধূপটা এনেছে। ও খুব বুদ্ধিমান ছেলে।'' ভোলাবাবু মনে মনে বেশ খুশী হলেন। কিন্তু একে একে যত ভক্ত ঘরে ঢুকছে জীবনকৃষ্ণ ততবার কথাটির পুনরাবৃত্তি করছেন। ৩বার, ৪বার, ৫বার, ৬বার একই কথা বলার পর উনি বুঝতে পারলেন ''ভোলা খুব বুদ্ধিমান ছেলে'' কথাটি ব্যাঙ্গ করেই বলছেন। বস্তুত এটি পুরস্কার নয়, তিরস্কার। তখন উনি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলেন, 'চরম দণ্ড পেয়েছি, আর কখনো ভুলেও একাজ করব না।''

১৯৫১-৫২ সাল পর্যন্ত (কালী ব্যানার্জী লেনে থাকার সময়) তাঁর ঘরে যাওয়ার ব্যাপারে খুব লোক বাছাবাছি ছিল। সুস্থ সবল দেহ হওয়া চাই এবং ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণকে বা তাঁকে স্বপ্নে দেখা চাই। তবে তিনি ঐ ঘরে আলোচনা চক্রে যোগ দেবার অধিকার পেতেন।

ঠাকুরকে স্বপ্নে দেখে তাঁর ঘরে যাওয়ার অনুমতি মিললে কোন ভক্ত হয়ত গেলেন তাঁর ঘরে। ঘরে প্রবেশমাত্র সুমিষ্ট ও সাদর আপ্যায়নের স্বর শুনতে পেতেন— 'আসুন, আসুন'। দেখতেন খাটে তিন চারজনকে নিয়ে মধ্যমণি হয়ে বসে আছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। মেঝেতে বিশেষত শীতকালে ঢালা বিছানায় (পরে জানতে পারেন ওটি শ্রীজীবনকৃষ্ণের শীতের নিত্য ব্যবহার্য্য লেপখানি) ঘেঁষাঘেষি হয়ে আরও কয়েকজন বসে। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত পাঠ চলছে।

নবাগত কিছু স্বপ্ন দেখেছেন কিনা জানতে চান। গভীর মনোনিবেশ সহকারে স্বপ্ন শোনেন। দ্রষ্টা হয়ত দেখেছেন— শ্রীশ্রী ঠাকুর ও শ্রীম ঘোড়ার গাড়ী চড়ে তার বাড়ীতে এলেন। শুনে সোৎসাহে ব্যাখ্যা শুরু করতেন— বাবা, তোমাকে নিত্য কথামৃত পড়তে বলছে এই স্বপ্নে। মাস্টারমশাই (শ্রীম) কথামৃতের প্রতীক। পার তো একটু একটু কথামৃত পড়। কী অপূর্ব অভিনব ব্যাখ্যা। আগন্তুকের আগমনে ও কথাবার্তায় পাঠ সাময়িক বন্ধ থাকে, তাঁর নির্দেশে পাঠ পুনরায় শুরু হয়। সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হলে ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে যে যেখানে বসে থাকেন সেইখানেই ধ্যান করতে বসে যান। ধ্যানান্তে আলো জ্বালা হয়। ধ্যানে কারও কোন দর্শন হল কিনা তাই নিয়ে আলোচনা হয়। তারপর আবার পাঠ ও তার অশ্রুতপূর্ব মধুময় ব্যাখ্যা। সঙ্গে সঙ্গে ফুটে ওঠে নানা লক্ষণ— ভাব, সমাধি, অর্ধবাহ্যদশা ইত্যাদি যৌগৈশ্বর্য। আখ্যার চেয়ে ভাল লাগে ব্যাখ্যাকে। ব্যাখ্যার চেয়ে ব্যাখ্যাতাকে।

নবাগতকে কোন কথার সূত্রে জিজ্ঞাসা করেন, বলতে পার বাবা, ভগবান কোথায় আছেন? সংশয় জড়িত কণ্ঠে উত্তর হয়— সর্বভূতে। উত্তর মনঃপূত না হওয়ায় প্রশ্নটি ঘুরিয়ে নিয়ে বলেন, আচ্ছা, ঠাকুরকে স্বপ্নে

দেখেছ বললে না? তা কোথায় দর্শন করলে? আজ্ঞে দর্শনটি হয়েছে এলাহাবাদে। এবারও উত্তরে যথেষ্ট ত্রুটি রয়েছে সেকথা ধরিয়ে দিলেন সুন্দর করে। বুঝিয়ে দিলেন— স্বপ্ন ফোটে ব্রেনে (Brain), ব্রেন দেহেতে, অতএব ঠাকুরকে দেখেছ নিঃসন্দেহে দেহের মধ্যেই। ঠাকুর— ভগবান। ভগবান দেহের ভিতরেই।

তাঁর ঘরে এসে তাঁর শ্রীমুখ থেকে ভাগবত কথা যারা শুনতেন তাদের মুড়িমুড়কির মত অজস্র দর্শন-অনুভূতি হত। একদিন নবদ্বীপের ভোলাবাবু শ্রীজীবনকৃষ্ণকে বললেন, এখানকার অনেকেই মা কালীকে নিয়ে কত দর্শনের কথা বলেন, আমার তো এত দর্শন হয় অথচ কালীমূর্তি একবারও দেখতে পাই না কেন? উনি বললেন, পাবি রে পাবি। কী আশ্চর্য! সেই রাত্রি থেকেই ভোলাবাবু স্বপ্নে মা কালীর দর্শন পেতে লাগলেন। বেশ কিছুদিন একটানা কালীদর্শন করে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। আর ভাল লাগছে না। তখন একদিন স্বপ্নে মা কালীকে বললেন, মা তুমি আমার ভিতরে ঢুকে যাও। আর তোমার দর্শন পেতে চাই না। কালীকে দেখছেন ঠিক যেন একটি কালো মেয়ে। তিনি দ্রষ্টার কথা শুনে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। ... ঘুম ভাঙল। এরপর থেকে মা কালীকে আর কখনও স্বপ্নে দেখেননি। অবাক হয়ে ভাবতে থাকেন এ কোন মহাপুরুষের পদপ্রান্তে বসার সুযোগ পেয়েছেন তিনি।

এই প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের একটি উপমা স্মরণ করা যেতে পারে। একজন লোকের একটি রঙের গামলা ছিল। তার কাছে যে যে রঙে কাপড় ছোপাতে চাইত তাকে সেই রঙে কাপড় ছুপিয়ে দিত ঐ একই জলে ডুবিয়ে। একজন চালাক লোক দূরে দাঁড়িয়ে সব দেখছিল। রঙের গামলার অধিকারী পুরুষটি তাকে কাছে ডেকে বলল, তুমি কোন রঙে কাপড় ছোপাতে চাও? সে বলল, তুমি যে রঙে রঙেছ আমাকে সেই রঙে রাঙিয়ে দাও। কাপড়— দেহ, কারণশরীর। কারণশরীর ইষ্টমূর্তি ধারণ করে দেখা দেয় (শিব, কালী, রাম, কৃষ্ণ ইত্যাদি রূপে)। সত্যিকারের

চালাক লোক সংস্কারজ ইষ্টমূর্তি দর্শনে (আংশিক ভগবান দর্শনে) তৃপ্ত হন না। যাঁর সান্নিধ্যে তা সহজলভ্য হয় সেই রঙের গামলার অধিকারী পুরুষটিকে, ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত মানুষটিকে, অন্তরে দর্শন করে তাঁর সত্তা তথা ঈশ্বরত্ব লাভ করে ধন্য হতে চান।

এক ভদ্রলোক জানালেন, তিনি স্বপ্নে দেখেছেন— মাকালীর পায়ে মল পরিয়ে দিচ্ছেন। প্রশ্ন করলেন, তাহলে কি কালীঘাটের মাকে একটা সোনার মল গড়িয়ে দেব? শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, সে কী রে! ও তো মল নয়, ও যে বেড়ী। তুই সংস্কারের পায়ে বেড়ী দিয়েছিস বাবা। এ খুব ভাল স্বপ্ন রে। পুরোন সংস্কার তোকে আর বাধা দিতে পারবে না।

এই প্রকার অসংখ্য দর্শনের অভিনব যৌগিক ব্যাখ্যা শুনে প্রাণ জুড়িয়ে যেত, ঘটত সংস্কার মুক্তি, জেগে উঠত ধর্ম সম্বন্ধে নূতন ধ্যান-ধারণা। উপলব্ধি হত নিজের অজান্তে তারা কখন ভিতরে ভিতরে বদলে গেছেন— নূতন মানুষ হয়ে গেছেন। অনুভব করতেন তাঁর ব্যক্তিত্বের চৌম্বক আকর্ষণ। অনেকে বহু দূর গ্রাম থেকে এসেছেন কলকাতায় চাকরী করতে। অফিস করার পর কদমতলায় ওনার ঘরে দুঘণ্টা কাটিয়ে তারপর বাড়ী ফিরতেন অনেক রাত্রে। কিন্তু একদিনও না এসে থাকতে পারতেন না। প্রাকৃতিক দুর্যোগকেও অগ্রাহ্য করে মানুষ আসত তাঁর কাছে অজানা অমোঘ আকর্ষণে, যার কাছে হার মানে এমনকি মায়ের ভালবাসাও। বাড়ী ফেরার সময় তাঁর কাছে অনুমতি চাইলে তিনি হাতজোড় করে বলতেন, আবার আসিস বাবা— কথাগুলি এতই আন্তরিকতাপূর্ণ যে সে আহ্বান অগ্রাহ্য করে কার সাধ্য! যারা নিত্য আসত তারা পরপর দু'তিন দিন না এলে উনি ছট্‌ফট্‌ করতেন। অন্যদের কাছে খোঁজ খবর নিতেন। অবশেষে সেই ভক্তটি এলে অনুযোগের সুরে বলতেন— এতদিন কোথায় ছিলি বাবা? তোকে কাছে পেয়ে কি মনে হচ্ছে জানিস? বলেই চণ্ডীদাসের পদ সুর করে বলতেন—

শতেক বরষ পরে বঁধূয়া আইল ঘরে
রাধিকার অন্তরে উল্লাস

হারানিধি পাইনু বলি হৃদয়ে লইনু তুলি
রাখিতে না সহে অবকাশ।

প্রথম প্রথম তিনি একাই পাঠ ও ব্যাখ্যা করতেন। পরে যারা স্বপ্নে পাঠ করার আদেশ পেত তাদের পাঠ করতে দিতেন, উনি ব্যাখ্যা করতেন। এ বিষয়ে প্রথম নির্দেশ পান বিষ্ণু পাল। তিনি দেখলেন, তার ভিতর থেকে কে যেন বলছে ''আমি এই পাঠ শুনব, আমি এই পাঠ শুনব।'' শ্রীজীবনকৃষ্ণ শুনে বললেন, তোমার উপর পাঠের আদেশ হয়েছে।

মানুষ হিসাবে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ছিলেন অতুলনীয়। একদিন ভক্তেরা সব ঘরে বসে আছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বাইরে প্রস্রাব করতে গিয়ে দেখলেন ২-৪ ফোঁটা বৃষ্টি গায়ে পড়ল। খোলা বারান্দায় ভক্তেরা জুতো রাখত। উনি কাউকে কিছু না বলে পাঁজাকোলা করে একগাদা জুতো বুকে করে ঘরে নিয়ে এসে ফেলতেই অনেকে হাঁ, হাঁ করে উঠলেন। 'তোরা থাম' বলে বাকী জুতোগুলোও নিয়ে এসে আবার জোড়া জোড়া করে সাজিয়ে রাখার পর বললেন, বৃষ্টি পড়ছে, ভিজে জুতো পায়ে দিয়ে সব বাড়ী ফিরবি, জ্বর হবে যে, সর্দি কাশি হবে যে!

এক ভক্ত বাইরে সাইকেল রেখে ঢুকেছেন ওনার ঘরে। উনি বললেন, কিসে এলি? ভক্তটি বললেন, সাইকেলে। উনি প্রশ্ন করলেন, সাইকেল কই? উত্তর হল, বাইরে রেখেছি। তখন বললেন, সামনে এনে জানলার রডের সংগে চাবি দিয়ে রাখ। অগত্যা তাই করতে হল। ফিরে এসে ঘরে বসা মাত্র বললেন, সাইকেলের দিকে মন পড়ে থাকলে এখানকার ক'টা কথাই বা কানে ঢুকবে। আর যদি বলিস ভগবান দেখবেন, তাহলে ভগবানকে যে কষ্ট দেওয়া হয় বাবা!

একদিন সতীশবাবু বাজারের ব্যাগটা শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরের জানলায় রেখে এগিয়ে গিয়ে বসেছেন। ভোলাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, ব্যাগে কী আছে? উত্তর হল— বাজার। ভোলাবাবু বললেন, ভগবানকে আলুটা মুলোটা দেখাতে নিয়ে এসেছিস। বলিহারী কাণ্ডজ্ঞান! শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, কী হলো রে?

সব শুনে বললেন তা তো বটেই বাজারের ব্যাগ হাতে কী কেউ ভগবানের কথা শুনতে যায়? পরে একটিপ নস্য নিয়ে বললেন, ভোলা এক কাজ করিস বাবা। রোজ সকালে টুক করে বাজারটা করে নিয়ে সতীশের বাড়ী পৌঁছে দিয়ে আসবি। এটুকু করতে পারবি না? সকলে হেসে উঠল। উনি গলা ছাড়িয়ে বললেন, ওর কত অসুবিধা জানিস? বাড়ীর কাছে বাজার পাওয়া যায় না। অফিস ফেরৎ বাজার করবে না তো সকালে কী খেয়ে অফিসে যাবে? ও প্রতিদিন আমার এখানে আসার সময় বাজার করে আনবে। এ নিয়ে কিছু বলবি না।

পরদিন বাজারের থলিটা সরু বারান্দায় যেখানে সকলে চটিজুতো খুলে রাখে সেখানে রেখে ওনার ঘরে ঢুকেছেন। উনি বললেন, আজ বাজার আনিস নি বাবা? সতীশবাবু বললেন, হ্যাঁ এনেছি। জিজ্ঞেস করলেন, থলি কৈ বাবা? উত্তর হ'ল, রকে। রেগে উঠে উনি বললেন, পয়সা দিয়ে খাবার জিনিস কিনে তা রকে চটি জুতোর সংগে রেখেছো! যাও শিগগীর ওটা জানলার কাছে রাখ। সতীশবাবু তাই-ই করলেন। পরদিন ভোলাবাবু বললেন, নরেশদা তো ঠাকুরের ওখানে যায়। ওর দোকানে ব্যাগটা রাখলে কেমন হয়? দোকান থেকে ব্যাগ নিয়ে টুক করে ওঠা যাবে। কথাটা মনে ধরল। পরদিন কদমতলার ঘরে গিয়ে বসতেই আবার প্রশ্ন— আজ বাজার আনিসনি বাবা? সতীশবাবু বললেন, এনেছি, ব্যাগটা নরেশদার দোকানে রেখে এসেছি। শুনে বললেন, তা ভাল করেছিস। এতদূর বয়ে আনা আবার নিয়ে যাওয়া থেকে রেহাই। ওটা ভাল করেছিস।

নিত্য যাতায়াতকারী অনুরাগী বেকার যুবকদের বেকারত্ব ওনার নজর এড়াত না। তার ঘরে আসা ভক্তদের মধ্যে যারা বড় অফিসার, চাকরী দেওয়ার ব্যাপারে হাত আছে, তাদের কাউকে কাউকে বলতেন বেকার ভক্তদের চাকরী পাওয়ার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য। তারা কেউ চাকরী পেয়েছে শুনলে তাকে বুকে টেনে নিয়ে বলতেন, বাবা, আমার মাথা থেকে পাঁচমন বোঝা নেমে গেল।

ছোটদের প্রতি বিশেষ নজর দিতেন। কোন বাচ্চা ছেলে এলে তাকে আদর করে খাটে বসিয়ে বলতেন, আজ ও আমাদের প্রেসিডেণ্ট। এবার প্রেসিডেণ্টের অনুমতি নিয়ে পাঠ শুরু হোক। কী আশ্চর্য! ঘণ্টার পর ঘণ্টা সেই সব শিশু নীরবে মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে পাঠ শুনত কিছু না বুঝেও। ছোটদের তো বটেই বড়দের মধ্যেও যারা দূর থেকে আসত, বা যাদের বাড়ী ফিরতে দেরী হবে জানতেন, তাদের বলতেন, যাও বাবা আমার জামার পকেট থেকে একটা টাকা নিয়ে কাছেই দুলাল ঘোষের দোকান থেকে কিছু খেয়ে এসে নিশ্চিন্ত হয়ে এখানে বসো।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বিজয়া দশমীর দিন তাঁর ঘরে যারা আসতেন তাদের সকলকে বিশেষভাবে মিষ্টিমুখ করাতেন। ছোট বড় অনেকেই আসতেন। প্রণাম সেরে মিষ্টি নিয়ে যেতেন। সেদিন চেনাজানার মধ্যে অনেক অচেনা লোকও আসতেন, একগাল হেসে মিষ্টি নিয়ে যেতেন। বৃদ্ধদেরও সুমিষ্টবচনে বিশেষভাবে আপ্যায়িত করতেন, আন্তরিকতার স্পর্শে তারা মুগ্ধ হতেন, প্রীত হতেন। মানুষকে কিভাবে সম্মান দিতে হয় তার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেছেন তিনি।

একবার তাঁর এক অনুরাগী ফণীবাবুর স্ত্রী স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখে বাস্তবে মিলিয়ে নিতে এলেন কদমতলায়। ওনার ঘরের সামনের রাস্তায় পায়চারী করছেন। দূর থেকে প্রাণের মানুষটিকে বারবার দেখেও সাধ মিটছে না। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বুঝতে পেরে হীরুবাবুকে বললেন, বাবা, রাস্তায় পায়চারীরত মা-টিকে চলে যেতে বল। পরে উনি জিজ্ঞেস করলেন, মা-টি কে রে? হীরুবাবু বললেন, ফনীদার স্ত্রী। আমার পরিচিত। উনি বললেন, হ্যাঁ রে, ভাল করে বলেছিস তো? তাড়িয়ে দিসনি তো? হীরুবাবু বললেন, না না। হীরুবাবুর মেজাজ একটু রুক্ষ, উনি তা ভাল করেই জানেন। তাই ঠিক নিশ্চিন্ত হলেন না। বললেন, দ্যাখ, তুই আজ ফণীর বাড়ী যাবি। গিয়ে মায়ের পা দুটি ধরে আমার নাম করে বলবি, সন্তানের শত অপরাধ ক্ষমা কর মা। কথাটা তিনবার বলবি। হীরুবাবু

তাঁর আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছিলেন। নারীর সামান্যতম অসম্মানও শ্রীজীবনকৃষ্ণ সহ্য করতে পারতেন না।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে চৈতন্যদেবের জীবনের একটি ঘটনা। শ্রীবাসের বাড়ীতে দরজা বন্ধ করে ঘরের ভিতর নিত্য সংকীর্তনানন্দে মত্ত হতেন মহাপ্রভু। সেখানে নারীর প্রবেশ নিষেধ। গৌরচন্দ্রের আনন্দঘন মূর্তি দর্শনের অভিপ্রায়ে শ্রীবাসের শাশুড়ী ঘরের মধ্যে খাটের নীচে লুকিয়ে রইলেন। মহাপ্রভু বললেন, আজ হরিনামে তাঁর ভাব হচ্ছে না। নিশ্চয় অন্য কেউ এখানে আছে। ভাল করে খুঁজে দেখে এক ভক্ত যখন আবিষ্কার করলেন খাটের নীচে লুকিয়ে আছেন শ্রীবাসের শাশুড়ী, তখন মহাপ্রভুর সামনেই তাকে চুল ধরে হিড়হিড় করে টেনে এনে ঘরের বাইরে বের করে দরজা বন্ধ করে দেওয়া হল। তারপর আবার কীর্তন শুরু হল। এবার প্রভু ভাবোন্মত্ত হলেন।

পরিহাসপ্রিয়তা ছিল তাঁর চরিত্রের অন্যতম গুণ। গভীর তাত্ত্বিক আলোচনা করতে করতে হঠাৎ করে মজার গল্প বলতে শুরু করতেন— গল্প শুনে সকলে হেসে গড়িয়ে যেত। আবার সেই গল্পেরই যৌগিক ব্যাখ্যা অবলম্বন করে ফিরে যেতেন আলোচনার গভীরে।

এইরকম একদিনের ঘটনা— নিত্যসঙ্গকারীদের একজন বিষণ্ণ ও ভারাক্রান্ত হৃদয়ে ধীর পদক্ষেপে তাঁর ঘরে ঢুকলেন। তিনি প্রসন্নকণ্ঠে বলে উঠলেন— এসো বাবা, এসো, বেশ করে হাত পা মেলে দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে বোসো। মৃদুহাস্যে বললেন, একটা গল্প বলি শোন। মাস্টারমশাই (শ্রীম) ক্লাসে বলেছিলেন। গ্রামের এক কলুর দোকান। সামনে দোকান, ভেতরে ঘানি চলছে। গ্রামের ন্যায়রত্ন মশাই চান করতে চলেছেন। কলুর দোকানে এসে বলছেন— ওহে একটুকু তেল দাও তো, চানটা সেরে নিই। এক থাবড়া মাথায় দিয়ে বাকীটা সর্বাঙ্গে মাখছেন আর ঘরের মধ্যে ঘানির দিকে তাকাচ্ছেন। দেখছেন ঘানিতে জোড়া বলদটার চোখ ঢাকা আর তার গলায় একটা পেতলের ঘন্টি বাঁধা। উৎসাহের

সঙ্গে ন্যায়রত্ন মশাই কলুকে জিজ্ঞাসা করলেন— এটা কী করেছ হে, বলদটির গলায় ঐ ঘন্টিটি কেন বেঁধেছ? কলু উত্তর দিলে— আজ্ঞা ন্যায়রত্ন মশাই, আমি একা লোক। মাঝে মাঝে ঘানি দেখি আবার বেচাকেনাও করি। আমায় পাঁচবার ওঠাবসা করতে হয়। বলদটা ঘুরে ঘুরে ঘানি টানছে তাই ঘণ্টা বাজছে। যদি ঘণ্টা বাজা বন্ধ হয় আমি বাইরে থেকেই বুঝতে পারি যে ও থেমে গেছে, আর ঘানি চলছে না। তখন আমি হ্যাট্ হ্যাট্ আওয়াজ করি, বলদটা চলতে থাকে ও ঘন্টিটাও বাজতে থাকে। তাই ওর গলায় ঘন্টি বেঁধেছি। ন্যায়রত্ন মশাই তখন তর্ক তুললেন। বললেন, ধর ও যদি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে থাকে তখন কী হবে? কলু জবাব দিলে— কি জানেন পণ্ডিতমশাই, ও তো আপনার মত টোলে ন্যায়শাস্ত্র পড়েনি যে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মাথা নাড়তে থাকবে। ঘরে হাস্যরোল উঠল।

কথামৃত পাঠ শুরু হল। কেশব মন্ত্র না নিয়ে ভবসাগর পার হওয়াও যা আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়াও তা। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, কুকুরের লেজ ধরে না হোক গরুর লেজ ধরে কিন্তু বৈতরণী পার এখনও হয়। তবে বলি শোন—

দুই ছেলে রেখে মা গত হলেন। ছোটটি উকিল। পুরুত ভয় দেখিয়ে গেল মাকে উদ্ধার না করলে যমের দ্বারে আটকে থাকবে। মাতৃদায় বলে কথা। ছেলেরা আর দেরী না করে— পুরুতকে সব ব্যবস্থা করতে বলল। পুরুত তো লম্বা ফর্দ করে ফেললে। দুটো গরু চাই। অনেক টাকার ব্যাপার। শেষে সাব্যস্ত হল যে একটার মূল্য ধরে দিলেই চলবে। তারপর দিনক্ষণ দেখে যথারীতি সব অনুষ্ঠান সম্পন্ন হতে লাগল। মা এবার বৈতরণী পার হবেন। বড় ছেলের হাতে গরুর লেজটা ধরিয়ে দিয়ে পুরুত বললে, ভাবো, মা বৈতরণী পার হচ্ছেন— ওই ওপারে গিয়ে উঠলেন। ব্যাস্। এবার ছোট ছেলের পালা। সে মূল্য ধরে দেবে। কিন্তু টাকা আর বের করে না। কেবলই মাথা চুলকোতে থাকে। শেষে বললে, ঠাকুরমশাই, মাকে দাদা

এইমাত্র ওপারে রেখে এল তা মা আবার এপারে এলো কী করে? সকলে হেসে উঠলেন।

তারপর গম্ভীরভাবে বললেন, মিথ্যার বেসাতি দূর করতে এ যুগে ধর্মের ভার শ্রীভগবান নিজের হাতে নিয়েছেন। ধর্মের সমস্ত জটিলতা রহস্যময়তা ছিন্ন করে মানুষের অন্তরে রূপধারণ করে ফুটে উঠে মানুষকে জানাচ্ছেন, তুমি ব্রহ্ম, প্রতিটি মানুষই ব্রহ্ম। ধর্ম মানে ব্রহ্মত্ব তথা একত্ব লাভ আর কিছু নয়। আমাদের দর্শন-অনুভূতি এই সত্যকেই প্রকাশ করছে। আমাদের ধর্মজীবনে জিলিপীর প্যাঁচ নেই। ও হারুমামা ও যে ফুলুরীই হচ্ছে, জিলিপী তো হচ্ছে না— গল্পটা জানিস তো? তবে শোন— কোন এক গ্রামে হারু নামে একজন লোক বাস করত। তার তেলেভাজার দোকান ছিল। ভাল ফুলুরী তৈরী করতে পারত। তার ভাগ্নে মামার বাড়ী বেড়াতে এসেছে। হারু তাকে বললে, আমাকে জিলিপী করা শিখিয়ে দিতে পারিস? তাহলে পুজোপার্বনে জিলিপী করে বেচতে পারি। ভাগনে তাকে জিলিপী করা শিখিয়ে দিয়ে বলল, এবার তুমি নিজে করে দ্যাখো। হারু জিলিপী করতে বসে হাত না ঘুরিয়ে তার শরীরটাকে বিশেষত কোমরটা খুব করে ঘোরাতে লাগল। কেননা দীর্ঘক্ষণ ধরে হাত স্থির রেখে ফুলুরী করা অভ্যাস। তাতে করে জিলিপী না হয়ে সব ফুলুরীর মত গোল হতে লাগল। তাই ভাগনে বলছে, ও হারুমামা, ওতো ফুলুরীই হচ্ছে, জিলিপী তো হচ্ছে না। হাত স্থির রেখে কোমর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফুলুরী করার অপরূপ ভঙ্গীটিও দেখালেন। ঘরে প্রবল হাস্যরোল উঠল।

কথাপ্রসঙ্গে বললেন, ঠাকুরের মূলমন্ত্র হল কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ। যিনি অধ্যাত্মশিক্ষা দানের বিনিময়ে টাকা নেন বা সুখস্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করেন তিনি আদর্শচ্যুত হন অথচ নিজে তা বুঝতে পারেন না। যার যেমন মন, গল্পটা জানিস তো? তবে শোন্—

একটা কুকুর ও একটা বেড়াল ছিল। বর্ষাকাল। কুকুরটা খুব জলে ভিজলো। সে দেখল বেড়ালটা গেরস্তর উনুনের ধারে বেশ আরামে শুয়ে

আছে। সেও ভাবলে উনুনে একটু গা তাতিয়ে নেবে। যেই উনুনের দিকে গেছে অমনি বেড়ালটা ফোঁস করে উঠল। কুকুর বেচারী আর কী করে। আবার সে ছাঁচতলায় বসে বসে জলে ভিজতে লাগল। পরদিন সেই গেরস্তর ছেলেরা খড়ের দড়ি করে বেড়ালের গলায় বেঁধে রাস্তায় হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে চলল। কুকুর তাই দেখে বলল—

কাল যে ভারী চ্যাটাং চ্যাটাং কথা
আজ বিচালির দড়ি গলায় দিয়ে
যাওয়া হচ্ছে কোথা?

বিড়াল জবাব দিল—

যার যেমন মন
বাছারা আমার তুলসীর মালা গলায় দিয়ে,
নিয়ে যাচ্ছে শ্রীবৃন্দাবন।

দিচ্ছে বিচালির দড়ি আর বিড়াল ভাবছে তুলসীর মালা। ওনার গল্প বলার ভঙ্গী দেখে ঘরসুদ্ধ সকলে হেসে উঠল। পরে বললেন, দ্যাখ ধর্মকথা বলতে আমি কি কোথাও যাই? এই ঘরেই গ্যাঁট হয়ে বসে থাকি। বাইরের সুখসুবিধা যে হবে না কষ্টের মধ্যেই ঠাকুর ঠাকুর করতে হবে সেকথা আমায় জানিয়েছে। দৈববাণী করে বলেছে— ‘শোবার জায়গা হবে না’।

পুনরায় পাঠ শুরু হল। কথাপ্রসঙ্গে বললেন, দ্যাখ গীতাকার কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগের কথা বলেছেন। আমি বলি এক জলযোগই সত্য। সকলে হেসে উঠলেন। পরে বললেন, না রে, আমি রসিকতা করছি না। আমাকে দেখিয়েছে যোগের সূচনায় দক্ষিণ তলপেটে স্নিগ্ধ জ্যোৎস্না কিরণে বিজড়িত হয়ে জল কলকল করছে! আর এ কথাই বাইরে প্রতীকে বলা হয়েছে— পুজোর সূচনায় ঘটে বারি আনতে হবে। আসলে এই দেহঘটে ব্রহ্মবারি দর্শনের কথা বলতে চেয়েছে। ...

সংসারের পীড়নে হতাশাগ্রস্ত ভক্তটি সারাক্ষণ শ্রীজীবনকৃষ্ণের নানান

মজার গল্প শুনতে শুনতে ও হাসতে হাসতে উত্তীর্ণ হন আনন্দময় রাজ্যে। বাড়ী ফেরার পথে ভাবতে থাকেন কী মন নিয়ে গিয়েছিলেন আর কী মন নিয়ে ফিরছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রকৃতই দুঃখহরণ।

তাঁর ঘরে বৈষয়িক কোন আলোচনা হত না। ব্যক্তি পরিচিতি ঘটত অতি সংক্ষেপে। কেউ হয়ত এসেছে কাশীপুর থেকে, ব্যাস কাশীপুর নাম হয়ে গেল তার, কেউ বা বনগাঁ, কেউ সিঁথি আবার কেউ বানীর মামা, কেউ ট্রাইব্যাল অফিসার বলে নাম হল ট্রাইব্যাল, কেউ আবার সেপাই ইত্যাদি— প্রকৃত নাম জানাই হল না। সংক্ষিপ্ত পরিচয় পর্বের পরই প্রশ্ন ছুঁড়ে দিতেন, কিছু স্বপ্ন দেখেছিস বাবা? ওরে বল্ না। তুই তো বলবি মানুষের দেহে শ্রীভগবানের লীলার কথা, সেই তো সত্যিকারের ভাগবত রে। পুঁথি ভাগবতের চেয়ে সে যে অনেক বড় জিনিস!

জানা গেল তাঁকে দেখছে হিন্দু, দেখছে মুসলমান দেখছে খৃষ্টান, দেখছে পারসী, দেখছে ভারতবাসী আবার বিদেশী। দেখছে স্বপ্নে, ধ্যানে, তন্দ্রায় আবার জাগ্রতে। তাঁকে স্থূলে (খালিচোখে) কেউ দেখেছে বাজারে, কেউ রেলস্টেশনে, কেউ বাসে, কেউ সেলুনে, কেউ দেবালয়ে, আবার কেউ বা যুদ্ধক্ষেত্রে। যাকে দেখছে তিনি নির্বিকার— কদমতলার ঘরে বসে সর্বক্ষণ কথামৃত অনুশীলনে রত। দ্রষ্টারা এসে তাদের দর্শনের কথা জানালে তবে তিনি তা জানতে পারেন। দ্রষ্টাদের মধ্যে কেউ ধনী, কেউ দরিদ্র, কেউ শিক্ষিত, কেউ বা নিরক্ষর। তাঁর কাছে আসার পর যেমন লোকে তাঁকে দেখতে শুরু করেছে আবার তাঁকে না দেখে না জেনে তাঁর কথা না শুনেও বহু লোক তাঁকে দেখেছে আর তাদের সংখ্যাই হল বেশী। পরে ঘটনাচক্রে তারা আসে তাঁর কাছে— কথাপ্রসঙ্গে নিবেদন করে তাদের পূর্বদর্শনের কথা। তাঁর কাছে মেয়েদের আসতে দেওয়া হত না। তবুও তারা ঘরে বসেই তাঁকে দ্যাখে।

তাঁর অনুরাগীদের কেউ কেউ মাঝে মাঝে গজ্ গজ্ (grumble) করতো বৌমাদের তাঁর ঘরে আসতে দেন না বলে। একদিন ফেলুবাবু

কথামৃত পাঠ করছেন। যেখানে ঠাকুর নৌকাবিহার সেরে সুরেশ মিত্রের বাড়ীতে এসে ভক্তদের বলছেন, ভাড়াটা মেয়েদের কাছে চেয়ে নে না। ওরা কি জানে না ওদের ভাতাররা ওখানে যায় আসে? শ্রীজীবনকৃষ্ণ শুনে পাঠককে বললেন— থামুন, থামুন। এই তো মশাই ঠাকুর বলছেন বাড়ীর পুরুষদের ব্রহ্মবিদ্যা লাভ হলে বাড়ীর মেয়েদেরও হবে। যতক্ষণ না বাড়ীতে বসে মায়েরা আমাকে স্বপ্নে দেখছেন ততক্ষণ আপনাদের স্বপ্ন শুনব না। কী আশ্চর্য! সপ্তাহখানেক পর থেকে সত্যসত্যই যারা তাঁর কাছে আসে তাদের বাড়ীর মেয়েরা ঘরে বসেই তাঁকে দেখতে শুরু করল।

তারাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের স্ত্রী শ্রীজীবনকৃষ্ণের ওপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিল। তার ধারণা ছিল শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার স্বামীকে তুকতাক করেছেন। তা না হলে যে লোক অফিস ছাড়া সবসময় বাড়ীতেই থাকত সেই লোক সকাল সন্ধ্যা এখানে (শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে) থাকে কেন? কিছুদিন যাবার পর ভদ্রমহিলা স্বপ্নে ঠাকুরকে, শ্রীজীবনকৃষ্ণকে ও নানা দেবদেবী সব দর্শন করতে লাগল। তার বাড়ীর রাঁধুনী, এমনকি ওর মেয়েকে যে পড়াতে আসত সেই শিক্ষয়িত্রী পর্যন্ত শ্রীজীবনকৃষ্ণকে স্বপ্ন দেখতে লাগল। আর তারাবাবুর মারফৎ তাদের দর্শনের কথা শ্রীজীবনকৃষ্ণকে বলে পাঠাতে লাগল।

এইভাবে বাড়ীর কোন একজন লোক তাঁর কাছে এল, সে লোকটি তাঁকে স্বপ্ন দেখতে শুরু করল। ধীরে ধীরে তাঁকে দেখা শুরু হয়ে গেল সে বাড়ীতে। আবার কখনও বা বাড়ীর কর্তা যিনি তাঁর কাছে এসেছেন তিনি দেখেন পরে বাড়ীর মেয়েরা ঘরে বসেই তাঁকে দেখেন আগে। সিঁথির অরুণ ঘোষ বিশ্বাস করত না যে মেয়েরা ঘরে বসেই তাকে স্বপ্ন দেখে। একদিন ওনার মা বললেন, তুই হাওড়ায় যে সাধুর কাছে যাস তাকে আমি কাল স্বপ্নে দেখেছি। ছেলে বলল, কী করে জানলে যে উনিই সেই সাধু? মা বললেন স্বপ্নে আমায় মা কালী একজন বয়স্ক মানুষকে দেখিয়ে বললেন, এই সাধুর কাছেই তোর ছেলে যায়। এরপর সেই সাধুর বিবরণ শুনে অরুণবাবু নিঃসংশয় হলেন যে তাঁর মা জীবনকৃষ্ণকেই স্বপ্নে দেখেছেন।

বাপ-মা, ভাই-বোন, স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে সকলেই তাঁকে দেখতে থাকে, বাড়ীর কাজের লোকেরাও বাদ পড়ে না। পিতামহ দেখেন, পৌত্রও দেখে তাঁকে। কোন বিচার নেই কোন ভেদাভেদ নেই কোন গণ্ডিও নেই। তাঁকে দেখার জন্য শুধু প্রয়োজন হল মনুষ্যদেহ— আর কিছুই না। যারা দেখছে তাঁকে তাদের মধ্যে কতই না পার্থক্য। বয়সে, বিদ্যায়, বিভবে তাদের মধ্যে কতই প্রভেদ। তবু অন্তরে তাঁর রূপ দর্শনে ব্যবহারিকে এই বহুত্বের মধ্যেও ফুটে উঠল আত্মিক একত্ব। তিনি বহু হয়ে বহুকে এক করলেন। মনুষ্যজাতির মধ্যে একত্বের যে বহু আকাঙ্খিত চিত্র মহাপুরুষেরা মানস নয়নে এঁকে গেছেন সেই একত্বের বাস্তব সূচনা হল। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে আছে— *তুমি স্ত্রী, তুমিই পুরুষ, তুমি কুমার, তুমিই কুমারী। তুমিই জরাগ্রস্ত হয়ে দণ্ডহস্তে গমন কর আবার তুমিই সর্বপ্রাণীরূপে জন্মগ্রহণ কর। কিন্তু সেই 'তুমি' যে কোন কাল্পনিক ঈশ্বর নয়, একজন জীবন্ত মানুষ আর তার জগৎব্যাপী হওয়ার প্রমাণ দেয় অসংখ্য মানুষ— এই সত্য উপলব্ধির আলোকে ধর্মজগতের আবহমানকালের পুঞ্জীভূত অন্ধকার দূরীভূত হতে লাগল।

শাস্ত্রমতে যারা কঠোর শারীরিক পরিশ্রম করে তাদের নাকি আত্মিক স্ফূরণ হয় না। একথা যে সত্য নয়, প্রতিটি মানুষই যে ব্রহ্মত্ব তথা একত্ব (abstract equality) লাভের অধিকারী তা প্রমাণ করলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। একটি মেথর দুবেলা কেদার দেউটি লেন পরিষ্কার করে যায়। একদিন (২০.৬.৫৭) বেলা প্রায় তিনটে, কাজ সেরে মেথরটি ফিরে যাচ্ছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাকে ডেকে এনে কাছে বসালেন। দেখিয়ে দিলেন কী করে ধ্যান করতে হয়। কিছুক্ষণের মধ্যে সে ধ্যানে ডুবে গেল। ধ্যান ভাঙলে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ বাবা কিছু দর্শন হল? উত্তর হল— হ্যাঁ দেখেছি। আবার প্রশ্ন— কি দেখেছিস? তার বিস্ময়ের ঘোর তখনও কাটেনি। ভাঙা ভাঙা কথায় বুঝিয়ে দিল— দেখেছি আপনাকে আর ওই যে! সে দেখিয়ে দিল

---

*ত্বং স্ত্রী ত্বং পুমানসি ত্বং কুমার উত বা কুমারী, ত্বং জীর্ণো দণ্ডেণ বঞ্চসি ত্বং জাতো ভবসি বিশ্বতোমুখঃ।

ঘরে টাঙানো শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিটি। রাস্তার ঝাড়ুদার, লোকচক্ষে হেয়, সাধারণত অস্পৃশ্য, মানবব্রহ্ম শ্রীজীবনকৃষ্ণের অভিষেক হল তারও অন্তরে।

অমিয় নামে একজন ব্যক্তি আসত ওনার ঘরে। আক্ষরিক অর্থে সে ছিল অষ্টাবক্র। চলবার সময় সারা দেহ যেন বেঁকে চুরে যেত। সে-ও অসাধারণ সব আত্মিক দর্শন অনুভূতি লাভে ধন্য হয়েছিল শ্রীজীবনকৃষ্ণকে অন্তরে পেয়ে। কে ট্যারা, কে ঊনপাঁজুরে এসব বাছবিচার রইল না তাঁর ঘরে। শ্রীভগবান যে সকলকার।

কথামৃতে আছে, যার যেমন ভাব তার তেমন লাভ। নতুন যুগের সূচনা করলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ। একজনের মন চলেছে খারাপ পথে, শ্রীভগবান জোর করে তাকে টেনে নিলেন কাছে, কৃপা করলেন। একজন প্রতিবেশী, লোহাকারখানার শ্রমিক, নাম সনাতন। কাজ থেকে ফিরে নিষিদ্ধ পল্লীতে যাবার জন্য বের হয়েছিল। পথে শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরে ভিড় দেখে কৌতুহলী হয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে পড়ল। ভিতরে পাঠ হচ্ছিল। পাঠের কথা কানে যেতেই আকৃষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পাঠ শুনতে লাগল। মনের পরিবর্তন হয়ে গেল। সেখান থেকেই বাড়ী ফিরে গেল। পরদিন আবার ঐ পথ দিয়ে যাবার সময় একইভাবে আকৃষ্ট হয়ে পাঠ শুনতে লাগল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাকে আহ্বান করে ঘরের ভিতর বসতে বললেন। সে ঘরে বসে পাঠ শুনতে লাগল। তৃতীয় দিন পাঠ শেষে সকলে চলে গেলে শ্রীজীবনকৃষ্ণের পায়ে কেঁদে লুটিয়ে পড়ল। জানালো, প্রথম দিন পাঠ শুনে ফিরে গিয়ে রাত্রে স্বপ্ন দেখেছে— একটি সুন্দর জলাশয়ে স্নান করে উঠল। তখন একজন সাদা কাপড় পরিহিতা নারী এসে তার কপালে চন্দনের ফোঁটা পরিয়ে দিল। দ্বিতীয় দিন পাঠ শোনার পর রাত্রে স্বপ্নে দেখেছে, জ্যোতির্ময় পুরুষ শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার দিকে দুহাত বাড়িয়ে স্নেহঝরা কণ্ঠে আহ্বান করছেন— আয়, কাছে আয়। দ্রষ্টা ভাবছেন, আমি পাপী। আমি কী করে ওনার কাছে যাব। ওগো আমি যে পাপী আমি যে অপবিত্র— বলতে বলতে সে ছুটে পালাতে লাগল। কিন্তু শ্রীজীবনকৃষ্ণ আরও দ্রুত তাঁর কাছে এসে পড়লেন, তখন বাধ্য হয়ে লুটিয়ে পড়ল তাঁর পায়ে আর তিনি তাকে মাটি থেকে তুলে আলিঙ্গন দান করলেন। প্রথম রাত্রির স্বপ্নে আদ্যাশক্তি বরণ করে নিলেন, ভক্তিচন্দন দান

করলেন। দ্বিতীয় রাত্রেই শ্রীভগবান দর্শন দিলেন, আশ্রয় দিলেন তাঁর বুকে। এমনি আরও কত ঘটনা ঘটত নিত্য।

হরেনবাবু একবার রাজগীর যান উষ্ণপ্রস্রবণে স্নান করার জন্য। সেই সময় একদিন সকাল প্রায় ন'টার সময় কালী ব্যানার্জী লেনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ প্রস্রাব করতে বসে হরেনবাবুকে দেখতে থাকেন। কিছুদিন পর হরেনবাবু রাজগীর থেকে ফিরে ওর ঘরে এলে উনি সেই দিনটির কথা তাকে জিজ্ঞাসা করেন। হরেনবাবু বললেন, ''জীবুদা, ঠিক ঐ দিন ঐ সময়ে গরমকুণ্ডে চান করতে নেমে আর উঠতে পারছিলুম না। তখন তুমি এসে আমার হাত ধরে টেনে তুললে। তুমি টেনে না তুললে আমার শরীর গরমে সেদ্ধ হয়ে যেত।'' উনি হরেনবাবুর মুখে ঐ কথা শুনে ভাবস্থ অবস্থায় গেয়ে উঠলেন— ''এমন ব্যথার ব্যথী কে আর আছে হাত ধরে টেনে তোলায় ..... গৌরপ্রেমের ঢেউ লেগেছে গায়।''

শুধু আত্মিকে নয়, ব্যবহারিক জীবনেও তাঁর ঘরখানি হয়ে উঠেছিল বৈকুণ্ঠ। বৈকুণ্ঠ শব্দের অর্থ যেখানে কোন কুণ্ঠা থাকে না— ছোট বড় ভেদ নেই, সকলেই সমান। হিন্দু মুসলমান, ধনী দরিদ্র, শিক্ষিত অশিক্ষিত, ব্রাহ্মণ মেথরের কোন ভেদ নেই— সকলকেই সমান আদরে 'আয় বাবা আয়'— বলে নিজের খাটে তুলে বসাতেন। প্রথম দিকে তিনি শুধু কুমার ভক্তদের মেলানি দিতেন, বিবাহিতদের সংগে দূরত্ব বজায় রাখতেন। তারা বাইরে রকে বসে ঠাকুরের কথা শুনে চলে যেত। কিন্তু এবার সে ব্যবধান ঘুচিয়ে দিলেন। আলিপুকুরের গোলাম হোসেন খাঁ নামে এক মুসলমান, যার দুটি বিয়ে, চৌদ্দ পনেরটি ছেলে মেয়ে, তিনি যখন অদ্ভুত অদ্ভুত স্বপ্নে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে দেখে সেকথা জানালেন, তখন থেকে শ্রীভগবানের ইচ্ছা অনুধাবন করে বিবাহিতদের উনি কাছে টানলেন, ঘরে ঢুকতে দিলেন। বিবাহিত ও অবিবাহিতদের সমভাবে দর্শন ও অনুভূতি হতে লাগল। সংসারী ও অসংসারীর পার্থক্য ঘুচে গেল তাঁর ঘরে। প্রত্যেকেই অনুভব করতে লাগলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ সকলকেই ভালবাসেন তবে তার মধ্যেও তাকে একটু বেশী। চাঁদামামা যে সকলকার মামা।

তিনি একদিন দৈববাণী শুনলেন, 'পাশ্চাত্য কাঁদছে, আপনি দয়া করে সেখানে গিয়ে তাদের উদ্ধার করুন।' তিনি তাঁর প্রাণের ঠাকুরের আদেশ অগ্রাহ্য করে মনে মনে বললেন, কেন ভগবান, পাশ্চাত্য কাঁদছে কেন? তুমি কাঁদাচ্ছো তাই তো কাঁদছে। তুমি তো সর্বশক্তিমান। তুমি পাশ্চাত্যকে নিয়ে এসো না এখানে। তাহলেই তো ল্যাঠা চুকে যায়। পরে তিনি অনুরাগীদের বললেন, কী হল জানিস? দেখছে আমি নাম-মান-যশ চাই কি না। ওরে এই ৬৫ বছর বয়সে আমার পরীক্ষা হ'ল। কারণ ওখানে গেলে ওদের নানা রকম দর্শন অনুভূতি হত। ওরা আমাকে মাথায় করে রাখত। খুব নাম যশ হত। এই রকম আশ্চর্য এক আত্মপ্রচারবিমুখ মানুষ ছিলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ।

তিনি কুটিচক হয়ে থাকলেও মহাযোগের স্ফুরণের মাধ্যমে শ্রীভগবান তাঁকে প্রকাশ করে দিলেন জগতের দরবারে— সর্বশ্রেণীর মানুষের অন্তরে। কলকাতার মহাবোধি সোসাইটিতে বক্তৃতা দিতে এলেন আর্যদেব, ভারতীয় বৌদ্ধসংঘের প্রেসিডেন্ট। শুনলেন একটি মানুষকে সব সম্প্রদায়ের মানুষ নানাভাবে অন্তরে দর্শন করে। অমনি ছুটে এলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার কাছে জানতে চাইলেন, অত লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখে কেন— এর কোন শাস্ত্রসম্মত ব্যাখ্যা তার জানা আছে কিনা।

কিন্তু তাঁকে দর্শন করে আর্যদেব এতই অভিভূত হলেন যে বেশি কথা বলতে পারলেন না। পরে চিঠি লিখে তার বক্তব্য জানালেন। চিঠিতে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে স্বপ্নেশ্বরনাথ বলে সম্বোধন করে লিখলেন— এত লোক তাঁকে স্বপ্নে দেখে কেন এই প্রশ্নের উত্তর তিনি হিন্দু শাস্ত্রমতে দিতে পারেন। হিন্দুধর্মে ভগবান বিষ্ণুকে স্বপ্নেশ্বরনাথ বলা হয়েছে, কেননা তিনি স্বপ্নে ফুটে উঠে মানুষকে নিজের ইচ্ছামত নির্মাণ করেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণের বিষ্ণুত্বলাভ হয়েছে। তাই তাঁকে চাক্ষুষ না দেখে তাঁর কথা না শুনেও বহু মানুষ তাঁকে স্বপ্নে দর্শন করে। এখানেই শেষ নয়, পরবর্তী অংশে তিনি তার নিজের একটি রোমাঞ্চকর দর্শনের কথা নিবেদন করেছিলেন।

তিনি ফ্রান্সের মানুষ। পূর্বাশ্রমে নাম ছিল পল্ অ্যাডম্। কমাণ্ডার হয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ম্যাজিনো লাইনে যুদ্ধ ক্লান্ত শরীর নিয়ে তাঁবুতে শুয়ে কাতর কণ্ঠে প্রার্থনা জানাচ্ছিলেন— হে ঈশ্বর, এই ধ্বংসের তাণ্ডবলীলা কি বন্ধ হবে না? অমনি জ্যোতির্ময় এক পুরুষকে দেখা গেল। খালি গায়ে ধুতি পরে ন্যাড়া মাথায় পাগড়ী পরা সেই পুরুষ বললেন, তোমার ইচ্ছা পূরণ হবে, যুদ্ধ শীঘ্রই থেমে যাবে। যুদ্ধ থেমে গেলে তুমি আমার কাছে যেও— ভারতবর্ষে। সত্যিই এক সপ্তাহ পর যুদ্ধ থেমে গেল। তিনি চাকরী ছেড়ে ভারতে এলেন। এ প্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরেও সেই মহাপুরুষের দেখা পেলেন না। শুরু করলেন ভারতীয় দর্শনসমূহ নিয়ে গভীর অধ্যয়ণ। ন্যাড়া মাথা শান্তির দূত সেই জ্যোর্তিময় পুরুষ হয়ত বা অহিংসার পূজারী শ্রীবুদ্ধের অনুসারী হবেন এই ভেবে শেষে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করলেন। এতদিন পর শ্রীজীবনকৃষ্ণকে চাক্ষুষ দেখা মাত্রই (বিশেষত কথা বলতে বলতে হঠাৎ গামছাটা মাথায় পাগড়ীর মত করে বেঁধে নেওয়ার পর) বুঝলেন যুদ্ধক্ষেত্রে এঁনাকেই দেখেছিলেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

আর্যকৃষ্টির (স্বতঃস্ফূর্ত প্রাণশক্তির বিকাশ) মূর্তরূপ যে শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার প্রমাণ বয়ে নিয়ে এসেছেন আর্যদেবের ন্যায় অনেকে। তাঁর ঘরে এমনি কত বিচিত্র রুদ্ধশ্বাস ঘটনার বিবরণ শোনা যেত নিত্যদিন।

এই সময় রাধাচরণ মিত্র নামে এক ভক্ত শ্রীজীবনকৃষ্ণের ফটো তোলার জন্য ব্যাকুল হলেন। কিন্তু ফটো তোলায় তাঁর নিষেধ ছিল। তাই তাঁকে না জানিয়ে সুযোগ বুঝে একদিন গভীর ধ্যানে মগ্ন অবস্থায় তাঁর ফটো তোলালেন এক ফটোগ্রাফারকে দিয়ে। সেইদিন থেকে সেই ফটোগ্রাফার ও শ্রীজীবনকৃষ্ণ দুজনেই ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ভক্তটি ভয় পেয়ে সব কথা অকপটে জানালেন তাঁকে। তিনি শুনে বললেন, যা হয়েছে সব ঠাকুরের ইচ্ছায়। তবে বাবা, আমার জীবদ্দশায় ঐ ফটো যেন প্রকাশ করা না হয়। লোকে আমাকে না দেখে স্বপ্নে আমার রূপ দেখছে। এতে তারা বুঝবে যোগের কী অসাধারণ শক্তি। যোগেতে ভেল্কি হয়। ঘরে ফটো থাকলে এর গুরুত্ব বুঝবে না। এরপর দুজনেই ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠলেন। ফটো ওয়াশ করে দেখা

গেল ফটোতে ওনার চোখ খোলা। অথচ চোখ বন্ধ অবস্থায় (ধ্যানসমাধিতে মগ্ন) তোলা হয়েছিল সে ছবি। হয়ত বা ঐ মুহূর্তেই তিনি চোখ খুলেছিলেন। শ্রীভগবানের ইচ্ছাতেই যে এই ছবি উঠেছিল সে বিষয়ে কোন সন্দেহ রইল না।

নির্মলবাবু নামে একজন ভদ্রলোক নতুন এলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ সকলের মতো তাকেও প্রশ্ন করলেন, দ্যাখ্ আমাকে এই ঘরশুদ্ধ সকলে স্বপ্নে দ্যাখে। আবার অনেকে এখানে আসার আগে আমায় স্বপ্নে দেখেছে— এ কী করে হল বল্ দেখি? বেদে বলেছে যে, মানুষটা ভগবান দর্শন করে ভগবান হয়ে যায় তখন তাকে সকলে ভিতরে দেখবে। তা তুই তো শিক্ষিত বুদ্ধিমান লোক, তুই এর কী ব্যাখ্যা দিবি? নির্মলবাবু বললেন, ব্যাপারটা আমার ঠিক বিশ্বাস হচ্ছে না। তাছাড়া মানুষ কি কখনও ভগবান হয়? তা হতে পারে না। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— আচ্ছা, বেশ। তুই কোন স্বপ্ন দেখেছিস? যদি দেখে থাকিস তো বল্। নির্মলবাবু বললেন, হ্যাঁ, গতরাত্রে একটা স্বপ্ন দেখেছি। স্বপ্নটা হল একটা স্টেজ। চারিদিকে অনেক দর্শক বসে আছে। হঠাৎ ঘোষণা করা হল— ভগবান আসছেন। সাগ্রহে প্রতীক্ষা করছি ভগবানকে দেখার জন্য। কিছুক্ষণ পর একজন মধ্যবয়স্ক স্বাস্থ্যবান মানুষ এসে দাঁড়ালেন স্টেজে। পরনে ধুতি, খালি গা, মাথার চুল খুব ছোট ছোট করে ছাঁটা, মনে হচ্ছে ইনিই ভগবান। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, সেই মানুষটিকে কখনও তুই দেখেছিস? নির্মলবাবু বললেন, না। তবে এখন যেন মনে হচ্ছে স্বপ্নের সেই মানুষটি আপনি। শ্রীজীবনকৃষ্ণ হাসতে হাসতে বললেন, The cat is out of the bag. ওরে আল্লা সুকৌশলী। কোরান পড়ে* এ কথাটা শিখেছিলাম। তোর তো বিশ্বাস হচ্ছিল না যে এরা আমায় আগে না দেখে আমার কথা না শুনে স্বপ্নে আমায় কী করে দেখতে পারে? তুইতো আগে আমায় কখনও দেখিসনি, তবে কী করে স্বপ্নে দেখলি বল দেখি? আর যেমন তেমন দেখা নয়— ভগবান সামনে এসে দাঁড়ালেন। তোকে প্রণাম হই বাবা। নির্মলবাবুর বাক্যস্ফূর্তি হল না।

*এক স্বপ্নে তিনি কোরান পড়ার নির্দেশ পান।

একদিন বিকেলে গোকুলবাবুর সহকর্মী ও তার দলবল শ্রীজীবনকৃষ্ণকে কালীকীর্তন শোনাতে এলেন। মূল গায়েন যুবকটির কপালে লম্বা চওড়া সিঁদূরের তিলক, প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে কীর্তন হল। এরপর শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, এবারে একটু হরিনাম হোক বাবা। এবার গায়ক শুরু করল, জয় রাধে গোবিন্দ জয়। শ্রীজীবনকৃষ্ণ খাটে উপবিষ্ট সকলের উদ্দেশ্যে বললেন, আয় আমরা নেমে দাঁড়াই। সকলে নেমে দাঁড়ালেন। ঘরে উপবিষ্ট সকলে দাঁড়িয়ে গাইতে লাগলেন ও নাচতে লাগলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য— আনন্দঘন মুহূর্ত।

সকলে মেঝেয় বসলেন। গায়কের সঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ আলাপ করছেন। জিজ্ঞাসা করলেন— বাবা তোমার দীক্ষা হয়েছে? গায়ক গর্বিত সুরে বললেন, আজ্ঞে হ্যাঁ। আমার গুরুদেব শ্রীশ্রী অমুক পরমহংস—। কথা শেষ হবার আগেই শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলে উঠলেন, হ্যাঁ, পরমহংস! তোমার গুরুদেবকে জিজ্ঞাসা করো তো পায়খানায় বসলে কি হয়? তবে বুঝবো পরমহংস। পরমহংস যেন মুড়ি মুড়কি। জানো কি রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বাহ্যে করতে বসলেও সমাধিস্থ হয়ে যেতেন। কাপ্তেনের (বিশ্বনাথ উপাধ্যায়) ঘরে বাহ্যে করতে গিয়ে সমাধিস্থ হয়ে গিয়েছিলেন। এই অশ্রুতপূর্ব কথা শুনে গায়কের সাথে সাথে অন্যান্য শ্রোতারাও স্তম্ভিত।

কিছুপরে কীর্তনের দল বিদায় নেবার পর আবার কথামৃত পাঠ শুরু হল। সরিষা স্কুলের সেক্রেটারী হরিসাধন মিত্র সেদিন ঘরে প্রথম এসে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখে অবাক। ওনার এলাকায় কীর্তনের সময় উনি শ্রোতাদের মধ্যে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দর্শন করেছিলেন। তাই অবাক হয়ে বললেন, আরে উনি এখানেও গান শুনতে এসেছেন। যখন শুনলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভগবৎকথা শুনতে বা বলতে ঘরের বাইরে কোথাও যান না তখন বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন।

অরুণবাবুর কাছে ঠিকানা পেয়ে আসানসোল থেকে এলেন নিমাই ব্যানার্জী। রাস্তা থেকে ঘরের দিকে দৃষ্টি ফেলতেই চোখাচোখি হ'ল শ্রীজীবনকৃষ্ণের সাথে। উনি বললেন, আয় বাবা সোজা ভেতরে চলে আয়।

যেন কতদিনের চেনা। বললেন, বোসো বাবা, কথামৃত শোন। পাঠ হ'ল— ঠাকুর তাঁর ছবি দেখিয়ে বলছেন— কালে এই ছবি ঘরে ঘরে পুজো হবে। শুনে বললেন, দেখুন ঠাকুরের কথা কেমন সত্য হয়েছে। ঠাকুরের ছবি এখন ঘরে ঘরে, দোকানে সর্বত্র। কিন্তু তাতে হচ্ছে কি? ঠাকুরের ভাব চিন্তাধারা কেউ নিয়েছে কি? আচ্ছা বাবা, তুই আমাকে কি আগে দেখেছিস? নিমাইবাবু বললেন, না। তবে আপনার গলার স্বর যেন শুনেছি মনে হচ্ছে। একটা ঘটনা বলি। কিছুদিন আগে সেলুনে গেছি। দেখছি দেওয়ালে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। কিন্তু তার দু'পাশে ২/৩টি ফিল্মস্টারের ছবি। ভাবলাম লোকে ঠাকুরকে এইভাবে নিয়েছে? মনে মনে বললাম, ঠাকুর জগতে কি এমন কেউ নেই যিনি তোমায় ঠিক চিনেছেন আর তোমার ভাবধারায় জীবন কাটাচ্ছেন? ওমনি সারা দেহ থরথর করে কাঁপতে লাগল আর শুনতে পেলাম কে যেন বলছে— আছে, আছে, আছে। চোখের সামনে পাঞ্জাবী গায়ে অনেকটা ঠাকুরের মত এক মানুষের চেহারা ভেসে উঠল। তারপর জ্ঞান হারিয়ে ফেলি। কানে সেই কণ্ঠস্বর আজও শুনছি— আছে, আছে, আছে। উনি মুচকি হাসলেন। একটুপর হঠাৎ খাটের উপর উঠে সাদা পাঞ্জাবী গায়ে দিয়ে ওনার দিকে তাকিয়ে হাসতে লাগলেন। বললেন, কি রে চিনতে পারছিস? নিমাইবাবু চম্‌কে উঠলেন, ভাবলেন, ছি ছি, গায়ে পাঞ্জাবী ছিল না বলে এতক্ষণ চিনতে পারিনি। এই তো সেই মূর্তি! বললেন, এবার চিনেছি, আপনাকেই আমি দেখেছিলাম সেদিন। সকলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ওরে তোরা চেয়ে দেখ। এই ছেলেটি আমাকে আগে কোথাও দেখেনি। অথচ কিভাবে আমাকে দেখেছে। তোকে প্রণাম হই বাবা।

মণিবাবুও জানালেন তিনি চেতলার হাটে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখেছেন কিছুদিন আগে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ রসিকতা করে বললেন, চেতলার হাটে কি আমি মাছ ধরার জাল বেচতে গেছিলাম? সকলে হেসে উঠলেন। একে একে অনেকেই এ জাতীয় অভিজ্ঞতার কথা জানাতে থাকেন।

এদিকে মানিকবাবুর বড় মেয়ের বিয়ে এসে পড়ল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, আমাকে বিয়ের হাওয়া গায়ে লাগাতে নেই। বিয়ের ক'দিন মেনোর

দেশের বাড়ী আলপুকুরে গিয়ে থাকব। হাওড়া স্টেশন থেকে ট্রেনে উলুবেড়িয়া গিয়ে সেখান থেকে হেঁটে আলপুকুর গ্রামে যেতে হয়। ট্রেনে যাবার সময় একই কামরায় একজন বিনা টিকিটের যাত্রী গেরুয়াধারী সন্ন্যাসী ছিলেন। টিকিট পরীক্ষক টিকিটের মূল্য দাবী করলেন। কিন্তু সন্ন্যাসীর কাছে টাকা না থাকায় টিটি কটু মন্তব্য করতে লাগলেন। সন্ন্যাসীটি পরের স্টেশনে নেমে যাবেন বলায় সাময়িক চুপ করলেন। কিন্তু পরের স্টেশনে নামলেন না লক্ষ্য করে টিটি আবার তাকে বাক্যবাণে জর্জরিত করতে লাগলেন। এই অস্বস্তিকর পরিবেশ এড়াতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার সঙ্গীদের মধ্যে একজনকে (মৃত্যুঞ্জয় রায়কে) সন্ন্যাসীটির গন্তব্য স্টেশন পর্যন্ত ভাড়া মিটিয়ে দিতে আদেশ করলেন। কেন এমন করলেন জিজ্ঞাসা করায় মৃদু হেসে মন্তব্য করলেন, মহাপ্রভু বলতেন, ভেকের আদর করতে হয়। ভেক পরলে সত্যের উদ্দীপনা হয়। তাই তিনি গাধাকে ভেক পরিয়ে সাষ্টাঙ্গ দিয়েছিলেন।*

সন্ধ্যার একটু আগে আলপুকুরে পৌঁছালেন। পাশাপাশি মাটির দু'খানা ঘর, ওপরে টিনের চাল। ঘরের সামনে টানা বারান্দা, বেশ উঁচু। চা জলখাবার খেয়ে হ্যারিকেন জ্বেলে শুরু হল কথামৃত পাঠ। ভোরবেলা শ্রীজীবনকৃষ্ণের মুখে মধুর রামকৃষ্ণনাম ও বহুবার 'ভগবান, ভগবান'— ধ্বনি শুনে সকলের ঘুম ভাঙত। ঘণ্টা খানেক ধরে সকলে মিলে রামকৃষ্ণ বন্দনা গান হত। তারপর মুখধোয়া, প্রাতঃকৃত্য সারা। পরে আবার পাঠ। সকলে মিলে বাজার করতে যাওয়া, ফিরে আবার পাঠে বসা। তারপর স্নান সেরে আবার পাঠ, যতক্ষণ না পাচক ঠাকুর খাবার জন্য ডাকছেন। সামান্যক্ষণ বিশ্রামের পর আবার পাঠ, আলোচনা। বিকালে কিছুক্ষণের জন্য আশেপাশে একটু বেড়ানো সন্ধ্যায় ধ্যান, আবার পাঠ, নৈশ আহারের পূর্ব পর্যন্ত। রঙ্গারাজ ও যোগীরাজ শ্রীজীবনকৃষ্ণের নিবিড় সান্নিধ্যলাভে ধন্য হল সঙ্গের গুটি কয়েক ছোকরাভক্ত। অষ্টমঙ্গলা চুকলে ফিরে এলেন কদমতলায়।

---

*১৯৫৮ সালের পরবর্তী সময়ে অবশ্য এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করতেন— ''গাধাতেই ভেক পরে''।

কিছুদিন থেকেই তিনি কলকাতার বাইরে কোথাও গিয়ে থাকার কথা ভাবছিলেন। একদিন ধ্যানে দৈববাণী শুনলেন— সোনার অন্নপূর্ণা মা 'মা' বলে চিঠি দিয়েছেন। কাশীতে সোনার অন্নপূর্ণা আছে। উনি স্থির করলেন কাশী যাবেন আর ফিরবেন না। ১৯৫৬ সালের ১লা অক্টোবর কাশী যাত্রা করলেন। ব্যবহারিক জগতেও তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাবধানী। তখন তো ট্রাভেলারস্ চেকের ব্যবস্থা ছিল না। তাই বেনারস যাত্রাকালে টাকা পয়সা গেঁজের (সরু লম্বা কাপড়ের থলি) ভিতর ভরে কোমরে জড়িয়ে ভাল করে বেঁধে নিয়ে তার উপর কাপড় পরে নিলেন। সঙ্গীদেরও সেই রকম করার নির্দেশ দিলেন। তারা গিয়ে উঠলেন 'শ্রীনাথ ভবনে।' কয়েকদিন পর বাড়ীওয়ালার আত্মীয় আসবে বলে চিঠি দেওয়ায় ঐ বাড়ী ছেড়ে উঠে এলেন 'কৃষ্ণানন্দ যোগাশ্রমে'। দোতলা বাড়ী, নীচের ঘরে সস্ত্রীক এক হিন্দুস্তানী কেয়ারটেকার থাকত। তার ঘরের দরজা খোলা থাকায় ভিতরটা দেখা গেল। সেখানে একটা শাড়ী মেলা ছিল। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তা দেখে বললেন্ এ ঘরে আমার থাকা হবে না। সেই মুহূর্তে অন্য ভাল বাড়ীও পাওয়া গেল না। গৃহকর্তার অনুরোধে ওনার যাতায়াতের সময় কেয়ারটেকারের ঘরের দরজা বন্ধ রাখা হবে— এই শর্তে ওখানেই দোতলায় থাকা ঠিক হ'ল। ওই বাড়ীতেও ছিল সোনার অন্নপূর্ণা। তাঁর নিত্য পূজা হত। পুজোর ছুটিতে অনুরাগী অনেকে সেখানে গিয়ে উঠলেন। দ্বিতীয় কদমতলা হয়ে উঠল যোগাশ্রম। এখানেও সেই কারবার। অনেক লোক আসতে লাগল— কেউ এলাহাবাদ থেকে, কেউ পাটনা থেকে। একজন এসে জীবনকৃষ্ণকে বললেন, 'মশাই' দশদিন আগে আপনাকে স্বপ্নে দেখেছি। লোক যারা আসতে লাগল তাদের স্ত্রীরাও বাড়ীতে থেকেই ওনাকে স্বপ্নে দেখতে লাগল। এরকম তারা কখনও দেখেনি, কারো কাছে শোনেও নি। খুব বাড়াবাড়ি হয়েছিল দুটি লোকের। একজন কবিরাজ আর একজন হোমিওপ্যাথিক ডাক্তার। তারা তো হৈ চৈ ফেলে দিলেন।

একদিন সুধীনবাবু, কেষ্ট মহারাজ, মৃতুঞ্জয় ও রঘুবাবুকে নিয়ে বেড়াতে বেড়াতে কবীরের আশ্রমে গেলেন। সেখানকার মোহান্ত সশিষ্য বসেছিলেন।

ভাল লোক। বেশ বড় আশ্রম আর নির্জন। ওরা কবীরের ছবি রেখেছে কিন্তু কোন বিগ্রহ করেনি। জীবনকৃষ্ণ মোহান্ত মহারাজকে বললেন, একটু কবীরের কথা শোনান। শুনতে শুনতে শ্রীজীবনকৃষ্ণের মাঝে মাঝে সমাধি হয়ে যাচ্ছিল। দেখে শুনে তিনি ও তাঁর শিষ্যরা তো হকচকিয়ে গেছেন। কিছুক্ষণের মধ্যে সদ্‌গুরুর কথা উঠল। জীবনকৃষ্ণ প্রশ্ন করলেন, মহারাজ সদ্‌গুরু কে? তিনি বললেন, যো শান্ত্ হ্যায় ওহি সদ্‌গুরু হ্যায়। জীবনকৃষ্ণ আবার বললেন, আপকা ক্যায়সা মালুম হোগা ওহ্ সদ্‌গুরু হ্যায়। তিনি কী উত্তর দেবেন ঠিক করতে পারছেন না। জীবনকৃষ্ণ তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন এই বলে যে যিনি সদ্‌গুরু তাঁকে আপনি আপনার দেহের ভিতর দেখবেন। তিনি কিছুই বুঝতে পারছেন না। তাকে অপ্রস্তুতে ফেলা উচিত নয় ভেবে জীবনকৃষ্ণ বললেন, তবে আমরা এখন উঠি। মোহান্তের যেন চট্‌কা ভাঙল। তিনি বললেন, আরে, পরসাদ, পরসাদ। একজন শিষ্য তখনই অনেক প্রসাদ এনে হাজির করলে। জীবনকৃষ্ণ বললেন, হাঁ, পরসাদ ভীখ্ মাংতা হ্যায়। কণিকামাত্র দিজিয়ে। প্রসাদ নিয়ে চলে এলেন। এত বড় মঠের মোহান্ত, ইনিও সদ্‌গুরু কিভাবে চিনতে হয় জানেন না।

কাশী ভ্রমণের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এবার রান্নার কোন আয়োজন ছিল না। হোটেলে খাওয়া। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর নিজের জন্য আলাদা ব্যবস্থা করতে দেননি।

ভোরবেলা তাঁর মধুর কণ্ঠস্বরে রামকৃষ্ণ বন্দনা শুনে এক ভক্ত তাঁর ঘরের সামনে গিয়ে দেখেন শ্রীরামকৃষ্ণের ক্যালেণ্ডারের কাছে গিয়ে শ্রীজীবনকৃষ্ণ দু'হাত তুলে নাচছেন আর মুখে 'জয় ঠাকুর, জয় ঠাকুর'— বলছেন। নাচের কী বিচিত্র ভঙ্গিমা। দুপায়ের গোড়ালী তুলে আঙুলের উপর ভর দিয়ে দুহাত তুলে নৃত্য। নৃত্যের পর প্রণাম, ছবিতে ঠাকুরের পা দুখানিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম। কী প্রাণঢালা আত্মনিবেদন। প্রণামের সঙ্গে যেন তার সমস্ত সত্তাকে নিবেদন করছেন ঠাকুরের শ্রীচরণে, এমনিভাবে বেশ কয়েকবার করলেন। তারপর ভক্তটিকে ডেকে নিয়ে খাটে বসিয়ে ধ্যান করালেন। ভক্তটি বুঝলেন,

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সান্নিধ্যই স্বর্গসুখ। ধ্যান ভাঙলে সকলকে কাছে ডেকে কথামৃত পাঠ শুরু করে দিলেন। কিছুপরে প্রাতঃকৃত্যাদি সারা ও ভ্রমণের পালা। বিকালে পাঠের পর অবশ্য সকলে বেড়াতে বের হলেও উনি বেরোতেন না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সংসারী না হলেও তিনি ছিলেন সংসারী মানুষের কাছে এক আদর্শ পুরুষ। সকলের দিকে সমান নজর। নৈশ আহার শেষ করে এসে প্রত্যেককে তাঁর কাছে খাওয়ার পূর্ণ বিবরণ দিতে হত। কোথায় খাওয়া হল, কেমন দোকান, কী খেলি? রুটি? বেশ বেশ। ক'খানা রুটি খেলি? ওমা মোটে চার খানা— ওতে কী হবে রে? কাল খাওয়া একটু বাড়াবি। মাংস খেয়েছিস? বাঃ বেশ। তা বাবা ক'টুকরো মাংস। ক'টুকরো আলু? এমনিভাবে খুঁটিয়ে, খুঁটিয়ে সমস্ত বিবরণ দিতে হত। তবে সেদিনের মত ছুটি।

একদিন উনি বললেন, ওরে আজ এ বাড়ীতে অন্নপূর্ণার প্রসাদ খাওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন বাড়ীর মালিক। তোরা সকলে আজ এখানেই প্রসাদ খাবি। তবে প্রত্যেকে যেন এক টাকা করে দিয়ে খাস। তখন অবশ্য এক টাকায় হোটেলে খুব ভাল খাবার পাওয়া যেত। যাইহোক সেদিন সকলে অন্নপূর্ণার প্রসাদ খেলেন। উনিও খেলেন।

ষষ্ঠীর দিন সকালে বেড়াবার সময় ঔরঙ্গজেবের আমলে পুরাতন বিশ্বেশ্বরের মন্দির ভেঙে মসজিদ গড়া ও ১৭৭৪ সালে অহল্যাবাঈ কর্তৃক নতুন মন্দির নির্মাণের প্রসঙ্গে কথা হচ্ছিল— ঠিক সেই সময় পুরাতন মন্দির প্রাঙ্গনে এসে পৌঁছালেন সকলে। সেখান থেকে মসজিদ, নতুন মন্দির সবই ভালভাবে দেখা যায়। দেখতে দেখতে শ্রীজীবনকৃষ্ণ ভাবাবিষ্ট হলেন। বদ্ধাঞ্জলি হয়ে বলছেন— জয় মহম্মদ! জয় বিশ্বনাথ! জয় ঠাকুর! আর ক্ষণে ক্ষণে ভাবসমাধিতে মগ্ন হচ্ছেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য, অপূর্ব পরিবেশ, শ্রীজীবনকৃষ্ণের কণ্ঠে একসঙ্গে বিশ্বনাথের, ঠাকুরের ও মহম্মদের জয়ধ্বনি।

বিজয়াদশমীর দিন সকলের কোলাকুলি সাঙ্গ হলে জলখাবার পর্ব শুরু হ'ল। ঐখানেই দেখা গেল ওঁর কুণ্ডলিনী কিভাবে প্রথম গ্রাসটি গ্রহণ

করে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ হাত দিয়ে খাবারের ঠোঙা থেকে সামান্য খাবার তুলেছেন অমনি ওঁর মাথাটি সাপের ছোবল মারার মত ঘাড় থেকে ভেঙে ডান হাতে খাবারের উপর পড়লো। মুখে সামান্য খাবার নিয়েই সঙ্গে সঙ্গে মাথাটি সোজা হয়ে গেল। কেবলমাত্র চায়ে চুমুক দেবার মত একটা আওয়াজ শোনা গেল। কেউ কেউ ওনার দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছেন দেখে বলে উঠলেন, কী রে খাবি তো? গোপালমা একবার দেখেছিলেন— শ্রীরামকৃষ্ণ আহার করতে বসেছেন। তাঁর মুখ থেকে একটা সোনার সাপ বেরিয়ে প্রথম গ্রাসটি গ্রহণ করে আবার তাঁর মুখেই ঢুকে গেল। 'আহার করি মনে করি আহুতি দিই শ্যামা মাকে।'

একদিন ওনার খুব জ্বর হ'ল। বিছানায় শুয়ে ছটফট্ করছেন। বাবা! আঃ! উঃ!— করছেন। ঐ ঘরে রঘুনাথবাবুও শুয়ে ছিলেন। ওনার কাতরানি শুনে উনিও কষ্ট পাচ্ছেন। ঘুমোতে পারছেন না। বললেন, একটু মাথা টিপে দেব? উনি সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলেন, না বাবা, আমার কিছু হয় নি। আমি ঠিক আছি। তুই ঘুমো। পরদিন কেষ্টমহারাজের কথায় সাবু কিনে মৃত্যুঞ্জয় রায়ের দাদার বাড়ী থেকে সাবু তৈরী করে আনা হল। সাবু দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, সাবু কে করল? সব শুনে উনি রেগে গেলেন। কেষ্ট মহারাজকে বললেন, তুমি বুড়ো হয়ে মরতে চললে এখনও আমাকে বুঝতে পারলে না? অন্যের বাড়ী থেকে খাবার করে আনতে বলেছ তুমি? সারাদিন আর কিছুই খেলেন না, উপোস দিলেন। টেন্শনে রঘুবাবুর পেট খারাপ হ'ল। বেশ কয়েকবার পায়খানা হল। বিকালে সকলে বেড়াতে বের হলে উনি রঘুবাবুকে নিজের বিছানায় শুতে বললেন। তারপর গায়ে মাথায় হাত বোলাতে লাগলেন, মাথা টিপে দিতে লাগলেন ঠিক স্নেহময়ী জননীর মত। ওনার অসুস্থতা দেখে সিদ্ধান্ত নিলেন কলকাতায় ফিরে যাবেন।

১৯৫৭-এর সেপ্টেম্বরে একদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণের ধ্যানে দর্শন হল— অসীম (বিশ্বাস) নামে একজন মুখে আঙুল দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে— যেন ইশারা করে চুপ করতে বলছে। তিনি এর ব্যাখ্যা করলেন, শ্রীভগবান তাঁকে চুপ করে থাকতে বলছেন অর্থাৎ নিসঙ্গ জীবনযাপন করতে বলছেন, তাহলে

জিনিসটা (তাঁকে অন্যদের অন্তরে দেখা) অসীমে পরিব্যাপ্ত হবে। মনস্থির করলেন, আগামী দুর্গাপূজার পর দ্বাদশীর দিন থেকে ঘর বন্ধ করে দেবেন। ভক্তসঙ্গ বন্ধ হল। 'শ্রীম কথা' বইতে ওনার এই অবস্থার আভাস পাওয়া যায় যেখানে ঠাকুর বলছেন, যা বলছি তোমরা এখন শোন তো শোন। এরপর যদি মা অবস্থা বদলে দেন তখন আর ভক্তসঙ্গ ভাল লাগবে না। ভক্তসঙ্গ বন্ধ হবার পর প্রায় সর্বক্ষণ ধ্যান করতে থাকেন। লক্ষ্মীপূজার দিন ব্রেনে খুব আলোড়ন হল। ব্রেন নরম (Soft) হয়ে গেল। ফলে সাধারণ লোকের সাথে কথা বলতে কষ্ট হতে লাগল। দরজা জানলা বন্ধ করে রাখেন। কারও সঙ্গে একটু বেশী কথা বললে এত কষ্ট হত যে রাত্রে ঘুমোতে পারতেন না। এই নিঃসঙ্গ জীবনযাপন কালে প্রায়ই তিনি অভয় (মুখোপাধ্যায়) নামে এক ব্যক্তিকে দর্শন করতেন। শেষে মাথায় ফুট কাটল— 'অভয়ং বৈ জনকঃ প্রাপ্তোসি' কথাটা অর্থাৎ জনক তুমি অভয়পদ লাভ করেছ। দুই থাকলেই ভয়। মানুষ যখন একা হয়— ভূতে ভূতে নিজেকে দেখতে থাকে তখন তার ভয় থাকে না। সে 'অভীঃ' হয়।

১৯৫৮ সালের ১লা জানুয়ারী তিনি দেখলেন, ওনার বন্ধু অমূল্য বাবুর মেয়ে বিধবা হয়েছে। তাকে দেখিয়ে অমূল্যবাবু বললেন, এবার আমার সুখের দিন গিয়ে দুঃখের দিন এল। এর অর্থ করলেন— ওনার অবস্থার পরিবর্তন আসছে, সুসময় আসছে। কেননা dream goes by contrary, স্বপ্নের অর্থ হয় বিপরীত দিক থেকে। বাস্তবিক ধীরে ধীরে তাঁর অবস্থার পরিবর্তন হতে লাগল। এ মাসের শেষ সপ্তাহে ঘটনাচক্রে ভক্তসঙ্গ শুরু হল।

২৩শে জানুয়ারী থেকে পরপর কয়েকদিন ছুটি পড়ায় কয়েকজন ছোকরাভক্ত আলপুকুরে মানিকবাবুর বাড়ীতে গিয়ে ছুটির দিনগুলি অখণ্ড ঈশ্বরচর্চায় কাটাবেন ঠিক করলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণের কাছে এসে তাদের অভিপ্রায় জানালেন। উনি মানিকবাবুকে বলে ঘরের চাবি দেওয়া করালেন। শেষে বললেন, আমি সঙ্গে না গেলে তোদের অসুবিধা হতে পারে। আর

তোদের সঙ্গে গেলে বেশ আনন্দ করা যাবে। ঠাকুর বলেছেন— এক ভাঁড় গঙ্গাজল যদি আলাদা রাখ তো শুকিয়ে যাবে কিন্তু গঙ্গাজলের মধ্যে যদি ডুবিয়ে রাখো তো ঠিক থাকবে। তোরা হচ্ছিস গঙ্গাজল। তোরা যদি না থাকতিস আমি কার সঙ্গে এসব কথা বলতাম। বাইরে তো সব আলু পটল। তোরাই আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছিস। নইলে ফেটে চৌচির হয়ে যেতাম। ভক্তেরা মেঘ না চাইতেই জল পেল।

দ্বিতীয়বার আলপুকুর যাত্রা করলেন। আলপুকুরে পৌঁছে ঘরের দাওয়ায় চেয়ারে বসে হাতপাখার বাতাস করতে লাগলেন। বন্ধুদের একজন তাকে বাতাস করার উদ্যোগ করতেই বললেন, তোমরা হাওয়া খাও, আমায় বাতাস করতে হবে না। দোহাই বাবা, আমায় গুরুঠাকুর বানিও না।

রাত্রে পাঠ সাঙ্গ হলে রান্নাঘরের চালায় ভক্তেরা আহারে বসলে উনি উঠোনে ইজিচেয়ারে বসে খাওয়া দেখতে লাগলেন। উনি রাত্রে কিছু খান না। খোলা উঠোনে হিম পড়ছে। একজন বলল, আপনি হিমে কেন বসেছেন, ঘরে গিয়ে বসুন। উনি কোমলকণ্ঠে বললেন, তোরা সকলে পেটভরে খাচ্ছিস দেখলে তবে যে আমার শান্তি হবে বাবা!

বাসুদেব রায় নামে এক সংসারী ভক্ত কদমতলার ঘরে এসে যখন শুনলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণ নেই, তিনি কয়েকজন কুমার ভক্তকে নিয়ে আলপুকুরে আছেন, তিনি কিছুতেই আর স্থির থাকতে পারলেন না। বাড়ীতে না জানিয়েই একে ওকে জিজ্ঞাসা করে সঠিক ঠিকানায় পৌঁছে গেলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণের সাথে সাক্ষাৎ হবার পর তাকে প্রণাম করে বাড়ী ফিরবার অনুমতি চাইলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, কোথায় যাবে বাবা? তোমার যাওয়া হবে না। আমি যেদিন যাব সেদিন আমার সঙ্গে যাবে। হাত ধরে ঘরের ভিতর নিয়ে গিয়ে বসালেন। দুখানা ডাব কাটা করালেন ও জোর করে খাওয়ালেন। তারপর গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে আদর করতে লাগলেন— মানিক আমার, সোনা আমার, ধন আমার— বলে। যেন এক শিশুকে আদর করছেন। অথচ তিনি ছেলেপিলের বাপ হয়েছেন তখন। বেশ উপভোগ করতে লাগলেন এই

দ্বিতীয় শৈশব অবস্থা পরমপিতার স্নেহপরশে। আনন্দে তার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল। বললেন, আমি যে এক জামাকাপড়ে চলে এসেছি, বাড়ীতে কিছু না জানিয়ে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, তুমি আমার গামছা নেবে, আমার কাপড় পড়বে, আমার বিছানায় শোবে, আমার বালিশে মাথা দেবে, আমার ব্রাশে দাঁত মাজবে, তবু তুমি যেতে পাবে না বাপী। তুমি আমার সাথে এক সঙ্গে বাড়ী ফিরবে। ভক্তটি ভাবতে থাকেন নিজের বাবাও কি কখনও বলেছেন, আমার ব্রাশে দাঁত মাজবি!

দুপুরে পাশে বসিয়ে খাওয়ালেন, ঠিক যেন স্নেহময়ী জননী। রাত্রে ভক্তটি স্বপ্ন দেখলেন, কুয়াশার স্তর ভেদ করে ধীরে ধীরে তার দিকে এগিয়ে এলেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। কাছে এলে স্পষ্ট দেখা গেল তিনি শ্রীজীবনকৃষ্ণ। দ্রষ্টাকে বললেন, তোর সাধন শেষ হয়ে গেল। ... ঘুম ভাঙল। আর ঘুম আসছে না আনন্দে। বাইবেলের Parable of ten vergins-এ বলা হয়েছে কুমারী মেয়েদের আলো জ্বেলে রাত জেগে বসে থাকতে হবে। ঘুমিয়ে পড়লে বর আসবে যখন, তার সাথে দেখা হবে না। এখানে অন্য জিনিস। ভক্ত নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়ে, বর এসে জাগিয়ে তুলে দেখা দেন, ঘুম যায় ছুটে। ভোরের অস্পষ্ট আলো ফুটলে কোন শব্দ না করে দরজা খুলে বাইরে গিয়ে প্রাতঃকৃত্য সেরে ফিরে এলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ জেগে উঠে অনুযোগের সুরে বললেন, অজানা জায়গায় অন্ধকারে একলা গেলে কেন? আমায় ডাকলে না কেন বাপী, এ তুমি খুব অন্যায় করেছ। যাইহোক দর্শনটি শুনে খুব আনন্দ প্রকাশ করলেন। বললেন— এখন দেখছি, এই দর্শনটা হবে বলেই তোমার এখানে আসা। তার বাড়ী ফেরার বারংবার অনুরোধ এবার মঞ্জুর করলেন।

বরকে নিয়ে বরযাত্রীরা মহানন্দে দিন কাটাতে থাকেন। এক একদিন এক এক রকম খাবার মেনু। প্রত্যহ দুপুরে বহু রকম তরিতরকারী দিয়ে ভাত খাওয়া। ভোজনানন্দ ও ভজনানন্দ চলে সমানতালে। এক সপ্তাহ ছোকরা ভক্তদের নিয়ে সর্বক্ষণ পাঠধ্যান করে আনন্দে কাটিয়ে ফিরে এলেন কদমতলায়। কিন্তু তাঁর আলপুকুর যাবার কথা জানতে পেরে অনেক বিবাহিত

ভক্তেরা এসে অভিমান প্রকাশ করল। তারা বলল, আপনি কি কেবল গুটি কয়েক অবিবাহিত ছোকরা ভক্তদের জন্য, আমাদের মত বিবাহিতদের নন? তিনি যত বোঝান যে, ওরে বাবা তা নয়, ঘর সংসার ছেড়ে আলপুকুর গেলে বৌমাদের, ছেলেপুলেদের অসুবিধা হত। কিন্তু তারা তা মানতে চায় না। তাই মার্চ মাসে আর একবার আলপুকুর যাওয়া হবে ঠিক হল। এবার মাস খানেক থাকবেন।

ঘরে যথারীতি পাঠ ও ভক্ত সমাগম শুরু হল। ফলে অধিকাংশ দিন ছোকরা ভক্তদের ঘরের বাইরে রকে অথবা গলি রাস্তায় স্থান হল।

রঙ্গের নট নটবর হরির নিত্য কত রঙ্গ দেখা যায়। একদিন শ্রীজীবনকৃষ্ণ কোন গুরুতর বিষয় আলোচনা করছিলেন। হঠাৎ হীরুবাবু কাঁপতে কাঁপতে মেঝেয় শুয়ে পড়ে বেহুঁস। শরীর ঘামে ভিজে গেছে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ একজনকে আদেশ দিলেন— ওরে আমার পাঞ্জাবীর পকেট থেকে টাকা নিয়ে দুলাল ঘোষের দোকান থেকে গরম দুধ এনে ওকে খাইয়ে দে। দুধ পানের পর হীরুবাবু চাঙ্গা হয়ে উঠল। সভাভঙ্গের পর একজনকে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন— ওকে সঙ্গে করে নিয়ে যা আর ওর বাড়ী পৌঁছে দিবি। কিছুদিন পর আবার হীরুবাবুর ঐ অবস্থাটি হল। আলোচনা বন্ধ রেখে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন এই হীরু, তুই আমার দিকে তাকা। অবাক কাণ্ড, তাঁর ঠোঁট দুটি দিয়ে কোন কিছু চোষার ভঙ্গীতে চুকচুক আওয়াজ করতে লাগলেন। মিনিট খানেক সময়। তারপর বললেন, যা, তোর সহ্য হচ্ছে না, তাই শক্তি টেনে নিলাম। তারপর আর কোনদিন হীরুবাবুর শারীরিক বৈকল্য দেখা যায় নি।

পূর্ব ব্যবস্থা মত আলপুকুর যাত্রার তৃতীয়পর্ব শুরু হল। এবার সদস্য সংখ্যা অনেক বেশী। মাত্র দুটি ঘর। তাই অধিকাংশই দুদিন বা তিন দিনের অতিথি। পাঠ ধ্যান আর জমিয়ে খাওয়া-দাওয়া। তরকারীর পদের সংখ্যা আর বৈচিত্র্য অবাক করার মত। একদিন খেতে বসে স্বল্পাহারী এক ভদ্রলোক খাওয়া শেষ করে বসে আছেন দেখে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, উঠুন, হাত ধুয়ে নিন। উনি অনুনয়ের সুরে বললেন, ঠাকুর একটু প্রসাদ! শ্রীজীবনকৃষ্ণ

বিরক্ত হয়ে লঘু ধমকের সুরে বললেন, যান্ যান্ হাত ধুয়ে ফেলুন। এখানে ওসব চলে না।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ সকলের সাথে এক পংক্তিতে আহারে বসতেন। কয়েকজনকে সাথে নিয়ে নিজেই বাজারে যেতেন। কোনদিন কী রান্না হবে, কেমন করে তা রাঁধতে হবে তা বলে দিতেন। সর্বক্ষণ উচ্চস্তরের ঈশ্বরীয় প্রসঙ্গ হ'ত বলে মাঝে মাঝে হালকা হাসির ফোয়ারা ছোটাতেন— বলতেন, একটু চাল ধোয়ানি জল দিলুম আর কি। রঙ্গপ্রিয় শ্রীজীবনকৃষ্ণের নিবিড় সান্নিধ্য লাভ করলেন অনেকে। মাস খানেক পর ফিরে এলেন কদমতলায়। ফেরার সময় দরজায় শিকল তুলতে গিয়ে দেখলেন, তিনি শিকল দিলেন না, ধীরেন (বনগাঁ) শিকল দিলেন। অন্যের অন্তরে নিজেকে দানের নতুন অধ্যায়ের সূচনা হ'ল।

১৯৫৮ সালের ৩রা জুন, আকস্মিকভাবে কলেরা রোগে আক্রান্ত হলেন তিনি। সারাদিন বেহুঁশ অবস্থায় শয্যাগত থাকলেন। পরদিন কিছুটা সুস্থ হলেন। কিন্তু সেদিন তিনি যেন আবহমানকালের পুঞ্জীভূত সংস্কারের ব্যাধি থেকে মুক্ত স্বরূপ প্রকাশোন্মুখ শুচিস্নাত এক নবজাতক। দ্বিধা এবং সঙ্কোচের আবরণ সরিয়ে দিয়ে নিজেই উদঘাটিত করলেন তাঁর ব্রহ্মত্বের স্বরূপ। তিনি বললেন, দেখ, আমরা এখানে পড়ি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত, আলোচনা করি তাঁরই জীবনী, তাঁরই কথার যৌগিক ব্যাখ্যা করি। আমরা সকলে তাঁর দাসানুদাস। অথচ তোরা (স্বপ্ন, ধ্যান, ইত্যাদি অবস্থায়) আমাকে দেখিস কেন? সকলকে নিরুত্তর দেখে নিজেই বললেন—

তোরা কেউ সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ রূপে, কেউ অঙ্গুষ্ঠবৎপুরুষ রূপে, কেউ বন্ধু রূপে, কেউ পিতা রূপে, কেউ ইষ্টরূপে, আবার কেউ গুরু রূপে— এরূপ কতভাবেই না আমাকে দর্শন করে সেকথা এখানে এসে বলছিস। তোরা বেদের কথার প্রতিধ্বনি করে বলছিস— 'তত্ত্বমসি'— তুমিই সেই— তুমিই সেই ব্রহ্ম— প্রমাণ সমেত।

বছর দশেক আগে অর্থাৎ ১৯৪৮-৪৯ সালে ওনার চোখে চাল্‌সে ধরেছিল। চশমা ব্যবহার করতে হল। একদিন স্বপ্নে দেখলেন— দেওয়ালে

টাঙানো ক্যালেন্ডারে শ্রীরামকৃষ্ণের ছবি। তার চোখে চশমা। চশমাটা খুলে পড়ে গেল নীচে ওনার বিছানার উপর, পরে মেঝেতে। উনি সেটা বিছানায় হাত বুলিয়ে খুঁজতে গেলেন কিন্তু পেলেন না। এই স্বপ্ন দেখার পর ওনার চোখ ভাল হয়ে গেল। আর চশমা ব্যবহার করতে হত না। এই স্বপ্নটির প্রকৃত অর্থ এবার হৃদয়ঙ্গম হ'ল। তিনি এতদিন শ্রীরামকৃষ্ণের দৃষ্টিতে জগৎ দেখেছেন, এবার নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখবেন অধ্যাত্ম জগতের সবকিছু।

তিনি শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ছাড়া অন্য কোন শাস্ত্রগ্রন্থ বড় একটা পাঠ করেন নি। কিন্তু এবার তাঁর ঘরে তাঁর কৃপায় অভিষিক্ত হয়ে এলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীধীরেন্দ্র নাথ রায়। শ্রীজীবনকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁকে নিয়ে মানুষের বিচিত্র দর্শন অনুভূতির সাথে শাস্ত্রের অদ্ভুত সাদৃশ্য ধরিয়ে দিতে লাগলেন। ফলে ঘরের আলোচনা অন্য এক মাত্রা পেল।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাঁর রঙ্গময়ী মায়ামূর্তি দর্শনের বিবরণ দিচ্ছেন— একটি বারান্দা। বারান্দার এক কোণে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। একটি ১১-১২ বছরের মেয়ে অর্ধবৃত্তাকার পথে বেষ্টন করে রঙ্গ করছে। ছোটাছুটি করে কখনও আঙুল মটকাচ্ছে কখনও করছে নানা রকম ভ্রুভঙ্গী। নানাভাবে রঙ্গ করছে বলেই তিনি এই দর্শনকে রঙ্গময়ী মায়ামূর্তি দর্শন বলেছেন।

ধীরেনবাবু বললেন— অর্ধবৃত্তাকার পথে শিবকে প্রদক্ষিণ করার কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। উমা এইভাবে শিবকে বরণ করেছিলেন। দীর্ঘ ৪১ বছর পর নিজের ২৬ বছর বয়সের এই দর্শনের সাথে শাস্ত্রের বিবরণের অপূর্ব সামঞ্জস্য রয়েছে শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিস্ময়াবিষ্ট হলেন।

কিন্তু বিস্ময়ের পালা তখনও শেষ হয় নি। রাত্রে কথামৃত পাঠ শেষ হয়েছে, কেউ কেউ ইতিমধ্যেই বিদায় নিয়েছেন। ধীরেনবাবুও চলে গিয়েছিলেন। কিন্তু আবার ফিরে এসেছেন। তাঁর মনে পড়েছে যে আজই উমা চতুর্থী। তিনি প্রকাশ করলেন যে উমা যেদিন শিবকে বরণ করেছিলেন সেই তিথিই উমা চতুর্থী বলে নির্দিষ্ট হয়ে এসেছে। আজ উমা চতুর্থী। সকলে বিস্ময়াভিভূত হলেন।

অপর একদিন (৪.৮.১৯৬০) কথামৃতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শ্রীজীবনকৃষ্ণ বললেন, ওই যে ঠাকুর বলছেন, ব্রহ্মই কাল। লোকে বলে কালে কত এল, কত গেল রে ভাই— কী করে বোঝাবি যে ব্রহ্মই কাল। মধ্যবয়সী একজন বললেন, এখানকার কথা দিয়ে বোঝাব। আমার বাবা আপনাকে দেখেছিলেন, আমি আপনাকে দেখি, আমার ছেলেমেয়েরাও আপনাকে দেখে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ, বললেন, এই তিন পুরুষ অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ— তিন পুরুষেই আমি আছি অর্থাৎ আমি শাশ্বত।

এমন সময় ধীরেনবাবু বললেন, তিন পুরুষে যে শাশ্বত হয় একথা আমাদের লোকাচারেও পাওয়া যায়। কেউ মারা গেলে এক বৎসর পরে তার সপিণ্ডকরণ হয়। সেই সপিণ্ডকরণের সময় তিন পুরুষের পিণ্ড এক সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়। তার মানে এই যে, তিন পুরুষের সঙ্গে মৃত ব্যক্তি শাশ্বত হয়ে রইলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ধীরেনবাবুর কথা শুনে কিছুক্ষণ নির্বাক হয়ে রইলেন। পরে ধীর গম্ভীর স্বরে বললেন, কার জন্য এসব নিয়ম হয়েছে, কে জানে!

শাস্ত্রোল্লিখিত বিবরণের সংগে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দর্শনের ও তাঁকে কেন্দ্র করে অনেকের দর্শনের এরূপ সাদৃশ্যের বহু উদাহরণ আবিষ্কৃত হতে লাগল দিনের পর দিন। দর্শনের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বেদ, পুরাণ, উপনিষদ, বাইবেল ইত্যাদি নানা ধর্মগ্রন্থের প্রাসঙ্গিক অংশ পড়া শুরু হল ঘরে। একজন দেখলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহটি মৌচাক। ঋক্‌বেদের মধুমতী সূক্তম ও ছান্দোগ্যের মধুবিদ্যা অধ্যায় থেকে জানা গেল— এই দর্শনের অর্থ, তিনি মূর্তিমান মধুবিদ্যা। তাঁকে স্বপ্নে সূর্যের মধ্যে দেখার অর্থ জানা গেল ছান্দোগ্য ও ঈশোপনিষদ থেকে— সেখানে বলা হয়েছে সূর্যমণ্ডলস্থ পুরুষ— পরমব্রহ্ম, মানুষের প্রকৃত স্বরূপ। ঋক্‌বেদের পুরুষসূক্ত থেকে জানা গেল তাঁর গায়ে অসংখ্য চোখ দেখার অর্থ— তিনিই সেই পুরুষসূক্তের অভিষ্ট সহস্রশীর্ষ সহস্রচক্ষু পুরুষ ইত্যাদি। ঐতরেয় উপনিষদে বলা হয়েছে সেই পুরুষ অন্তর্হিত হয়েছেন। অর্থাৎ ব্রহ্ম, যিনি একদা প্রকাশ হয়েছিলেন পরে আর তাঁকে দেখা যায় নি। আর সেই পুরুষটির স্মৃতি বহন করছে শ্রুতি।

তাঁকেই ফিরে পাবার জন্য বেদের কর্মকাণ্ডের অর্থাৎ পুরুষযজ্ঞের প্রতিষ্ঠা। সেই থেকেই এই পুরুষ আসবেন এই রকম একটা প্রত্যাশা চলে আসছে সব জাতির মধ্যেই। ইহুদিরা বললে মজেস-ই সেই মেসাইয়া (Messiah)— পরিত্রাতা। বুদ্ধকে বলা হয় তথাগত অর্থাৎ তিনিই এসেছেন। যীশু বললেন, আমি ও আমার স্বর্গস্থ পিতা এক। মহম্মদও বললেন, আমি আল্লার রসুল, মহাপ্রভুও বললেন, মুই সেই। আর ঠাকুরও বলছেন, যে রাম যে কৃষ্ণ সেই ইদানীং রামকৃষ্ণ। প্রতীকি লক্ষণ সহ অষ্টাবক্র সংহিতা কথিত দেহবান ব্রহ্ম তথা বেদের আদিপুরুষ হিসাবে মানুষের অন্তরে শ্রীজীবনকৃষ্ণের রূপ উদ্‌ভাসন সমস্ত অনুমানকে দূরে সরিয়ে দেয়— সত্যের আলোকধারায় অবগাহন করে আনন্দবিহ্বল অন্তর গুঞ্জরিয়া ওঠে, তত্ত্বমসি— তুমিই সেই, তুমিই সেই হারানিধি।

অসংখ্য মানুষ যে তাঁকে অন্তরে দর্শন করতেন শুধু তাই নয়— তিনিও সকলকে দেখতেন নিজের মধ্যে। উপনিষদের বাণী— 'সর্বভূতস্থম্ আত্মানম্ সর্বভূতানি চ আত্মনি—' নতুন তাৎপর্যে উদ্‌ভাসিত হ'ল। এমন অবস্থা হ'ল যে তিনি সব সময় কাউকে না কাউকে অন্তরে দর্শন করে তাতে পরিবর্তিত হতেন। বোধ হ'ত তিনি তেল মাখছেন না, ভোলাবাবু মাখছেন,— তিনি খাচ্ছেন না, জিতেনবাবু খাচ্ছেন— তিনি পা মেললেন না, সুব্রতবাবু পা মেললেন— এই রকম। তিনি বুঝলেন, জগতের মনুষ্যজাতির অন্তরে তার নিজেকে দান সম্পূর্ণ হয়েছে।

পাঠ শেষে প্রথমে তিনিই মাথায় ভাগবত ঠেকাতেন। তারপর অন্যদের দিতেন প্রণাম করার জন্য। ভাগবত প্রণাম কালে কোন না কোন ভক্তকে দেখতে লাগলেন। বললেন, আমি পূর্ণ, তাই ভাগবত প্রণামের ফলও আমাতে অর্শাচ্ছে না, ফলটা পাচ্ছিস তোরা।

স্বামীজী বলেছেন, অন্নদান বস্ত্রদান নিকৃষ্ট দান। তার চেয়ে বড় হ'ল বিদ্যা দান। আর সর্বশ্রেষ্ঠ দান হল ব্রহ্মজ্ঞান দান। শ্রীজীবনকৃষ্ণ 'মামেকং শরণং ব্রজ'— না বলে উল্টে নিজেকে অসংখ্য মানুষের মধ্যে বিলিয়ে দিয়ে তাদের অন্তর্নিহিত দেবত্বের উদ্বোধন ঘটালেন তথা তাদের পূজা করতে

লাগলেন। তিনি বললেন আমাকে আর পরমব্রহ্ম বলিস না। আমি আর মনুষ্যজাতি আত্মিকে এক, অভিন্ন।

একদিন ঘরে রামনাম গান হচ্ছে, উনি সারাক্ষণ ধ্যানস্থ হয়ে থাকলেন। দর্শন করলেন জিতেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জীকে, তাঁর এক অনুরাগীকে। এদিকে তখন জিতেনবাবু নিজের বাড়ীতে বসেই স্পষ্টভাবে রামনাম গান শুনতে পেলেন। অথচ তার বাড়ীর অপর কেউ তা শুনতে পেলেন না। তিনি এর কোন কারণ খুঁজে পেলেন না। পরদিন বিকালে কদমতলায় শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘরে ঢুকতেই উনি বললেন, বাবা জিতু, গতকাল তুই আসিসনি, ঘরে বেশ সুন্দর রামনাম গান হল, আমি ধ্যানে তোকে দেখলাম, আমি জিতু হয়ে গিয়ে নামগান শুনলাম। এক লহমায় গতকালের রামনাম শ্রবণের রহস্য উন্মোচিত হয়ে গেল জিতেনবাবুর কাছে।

স্বামী বিবেকানন্দের কল্পনার One and Oneness এখানে বাস্তবে রূপ পেল। অধ্যাপক জে. আর. ব্যানার্জীর কনিষ্ঠপুত্র নলিনী ব্যানার্জী কয়েকদিন কদমতলার ঘরে আসার পর একদিন তার একটি স্বপ্নদর্শনের কথা নিবেদন করলেন। তিনি দেখেছেন— স্বামী বিবেকানন্দ বলছেন, আমি আমেরিকায় লেকচারে এর (শ্রীজীবনকৃষ্ণের) কথাই বলেছি, 'One and Oneness' যা এইখানে ফুটেছে। তিনি তাঁর complete works এর Vol. vii page 161 দেখতে বলেছিলেন। আশ্চর্য আরও এই যে তখনও পর্যন্ত নলিনীবাবু জানতেন না যে স্বামীজির complete works আছে।

হরেনবাবু শ্রীজীবনকৃষ্ণের ছোটবেলার বন্ধু। তাকে ঠাকুর বারবার স্বপ্ন দিতে লাগলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণের পা পুজো করার জন্য। উনি শুনে 'না, না' করেন। তখন হরেনবাবু বললেন, আমি স্বপ্ন দেখেছি যে ঠাকুর আমায় তোমার পা পুজো করতে বলছেন। তুমি কেন করতে দেবে না? উনি উত্তরে বললেন, দেখ হরেন, আমায় ঠাকুর পরীক্ষা করছেন। আর আমি যদি আমার পা পুজো করতে দিই তাহলে আমার গতি এইখানে রুদ্ধ হয়ে যাবে।

কিছুদিন পর বললেন, 'আমার তো আর দুই বোধ নেই, এক বোধ।

এক বোধে কি করে পুজো নেব? পুজো নেওয়া চলে না।' তিনি আগে প্রণাম গ্রহণ করতেন কিন্তু এবার প্রণাম নেওয়াও তুলে দিলেন। প্রণামোদ্যত ব্যক্তিকে বলতেন, বাবা তুই আর আমি এক। তাই প্রণাম নয়। আলিঙ্গন দান করতেন, কখনও বা মস্তক বন্দনা— মাথায় মাথা ঠেকিয়ে নমস্কার।

আমেরিকার মেরোজী দম্পতিকে লেখা চিঠিগুলিতেও তাঁর একত্ববোধের অসামান্য পরিচয়ের স্বাক্ষর ফুটে উঠেছে। তিনি চিঠি শুরু করেছেন এইভাবে— আমার প্রিয় আপন সত্তা মিঃ মেরোজী (My beloved own self, dear Mr. Marozzi) আর শেষে লিখেছেন, তোমার আপন সত্তা শ্রীজীবনকৃষ্ণ (For ever and anon, your own self Jibankrishna)। বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ নয়, বিশ্বএকত্বের যে বার্তা বহু যুগ ধরে বেদান্ত বহন করছে তা মূর্ত হয়ে উঠেছিল তাঁর জীবনে।* কিন্তু আধ্যাত্মিকতার শীর্ষে অবস্থান করেও অতি সাধারণ মানুষের মতো জীবন কাটিয়েছেন। নিষ্কাম সরল ও অনাড়ম্বর জীবন যাপনের উজ্জ্বল উদাহরণ তাঁর জীবন। অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে তিনি বলতেন, দেখিস বাবা, আমায় তোরা গুরুঠাকুর বানাসনি— I am an ordinary man like you all, no better no worse. হাতের চামড়া টেনে টেনে দেখিয়ে বলতেন, দেখ, দেখ, আমি তোদেরই মত একজন সাধারণ মানুষ। তার বেশী কিছু নই, কমও নই। ভগবান বলে আমাকে দূরে সরিয়ে রাখিস না। আমাকে বড় দাদা বলতে পারিস, বন্ধুও বলতে পারিস।

স্বপ্ন নির্দেশে ১৯৪৯ সালে দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ 'ধর্ম ও অনুভূতি' নামক যে গ্রন্থটি তিনি রচনা করেছিলেন তা ছেপে প্রকাশ করেন নি। দীর্ঘ বার বছর পর ১৯৬১ সালের এক স্বপ্নে তা ছাপানোর আদেশ এল। বইটির কত দাম করতে হবে তাও অপর একজনের স্বপ্নে জানা গেল, তখন তা ছাপানো হল। সে বছরেই ইংরাজী Religion and Realisation লেখা শুরু করলেন। তার Foreward (মুখবন্ধ) অংশটুকু ছাপিয়ে দেশ বিদেশের বিভিন্ন জায়গায় পাঠানো হল। সাড়াও পাওয়া গেল মুগ্ধ পাঠকদের কাছ থেকে। পৃথিবীর

*Vedanta formulates not universal brotherhood but universal oneness.
— Swami Vivekananda

অপর প্রান্তে সুদূর হনলুলু (আমেরিকা) থেকে মেরোজী দম্পতি তাঁর লেখা পড়ে তাঁকে স্বপ্নে দেখে চিঠি লিখে জানালেন। তিনিও তাদের স্বপ্নদর্শনের ব্যাখ্যাসহ উত্তর লিখে পাঠালেন যেগুলি জগতের কাছে এক অমূল্য সম্পদ।

এই পর্বে শ্রীজীবনকৃষ্ণের জীবনে নিয়মপালনের যে শেষ চিহ্ন ছিল একাদশী করা তাও উঠে গেল ৯ই জুন ১৯৬১ সাল থেকে। ঐ দিন একাদশী হলেও তিনি ভাত ও মাছের ঝোল খেলেন। কিছুদিন পর বাড়ীর পরিবেশ সুখকর বোধ না হওয়ায় উনি স্থির করলেন পুরী ধামে নির্জন বাসে যাবেন আর ফিরবেন না। ১৯৬২ সালে ৭ই সেপ্টেম্বর উনি পুরীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন, উঠলেন অনাথবন্ধু ভবনে। এই বাড়ীটির একটি বাড়ীর পরেই আর একটি ছোট একতলা বাড়ী ছিল। নাম— অচিন্ত্যধাম। তার মালিক এক বৃদ্ধা। শ্রীজীবনকৃষ্ণের পুরী আগমনের পূর্বে তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন জীবন্ত জগন্নাথ রূপে শ্রীজীবনকৃষ্ণ তাকে অভয় দিচ্ছেন। অনাথনাথ শ্রীজীবনকৃষ্ণের শুভাগমনের পর তাঁর সঙ্গ কামনায় যারা পুরীতে এলেন তারা থাকতে লাগলেন অচিন্ত্যধামে। বৃদ্ধার জীবিকার একটা উপায় হয়ে গেল।

যেখানে শ্রীজীবনকৃষ্ণ সেখানেই সর্বতীর্থের সমাগম। প্রাণ জোড়ানো ভালবাসার স্পর্শ আর নিরবচ্ছিন্ন ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন। জাগতিক বিষয়ের আলোচনাও অল্পকাল মধ্যেই হরিকথায় রূপান্তরিত হোত— সমাপ্তি হত সমাধিতে। কথার মাধ্যমে দেহস্থ চৈতন্যের জাগরণে বুঝিয়ে দিতেন— কথার সার্থকতা হরিকথায়, অন্য সব কথা, কথার কথা।

একদিন খুব ঝড় উঠেছে। দমকা হাওয়ায় প্রকৃতির রুদ্র রূপ প্রকটিত। সেদিন তালের ফুলুরীর ব্যবস্থা হয়েছিল। উনি শিশু সুলভ ভঙ্গীতে হাসতে হাসতে বললেন, যত ইচ্ছে ঝড় হও বাবা, আমি কিন্তু তালের ফুলুরী খাবই। পরমুহূর্তে হাস্যরসের বিদায়। স্বতন্ত্র মানুষ। গম্ভীর গলায় সঙ্গীদের বললেন, তোদের কাউকে চাই না। এমন এক জিনিস জীবনে পেয়েছি যা নিয়ে আমি একান্ত একা থাকতে চাই, যেখানে আমি ও আমার দেহস্থ

অমৃতত্ব ছাড়া আর কিছু নেই। বলা শেষ হতে না হতেই অমৃত প্রাপ্তির সাড়া জাগল দেহে। সমাধিস্থ হলেন।

আর একদিন দুপুরে আনন্দবাবু পাঠ করছেন, শ্রীজীবনকৃষ্ণ শুনতে শুনতে ধ্যানে ডুবে গেলেন। মৃত্যুঞ্জয়বাবু রান্নাঘরে কাজ করছিলেন। সেখান থেকে ঝন্‌ঝন্‌ করে বাসন পড়ার শব্দে ধ্যান করতে করতে উনি চম্‌কে উঠলেন। ধ্যান ভেঙে গেল। কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইলেন। বললেন, এতে বৈষ্ণব অপরাধ হয় রে!

আদেশ হল প্রচলিত ধর্মমত প্রচারের অধিকার লাভ। তিনি আদেশ লাভের পর ১৯৫৬ সালে এক স্বপ্নে আজ্ঞা লাভ করেছিলেন।* আজ্ঞা হল ধর্ম জগতে নূতন মত চালাবার অধিকার। এরই ফলস্বরূপ এখানে বসেই পক্ষ কাল মধ্যে তিনি লিখলেন ধর্ম ও অনুভূতির ৩য় ভাগ। ধর্ম সম্বন্ধে নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সূচনা করে সমষ্টির সাধনের নিরিখে ঠাকুরের বাণীর দেহতত্ত্বে ব্যাখ্যা দিলেন। কারও ব্যষ্টির সাধনের পূর্ণতা লাভের পর তাকে কেন্দ্র করে বহু মানুষের যে দর্শন অনুভূতি হতে থাকে তাই-ই তার সমষ্টির সাধন। ধর্ম সম্বন্ধে প্রচলিত ধ্যানধারণা নস্যাৎ করে জানালেন আত্মিক একত্বই একমাত্র ধর্ম আর এই একত্বলাভ হয় আপনা হতে পরম এক ব্রহ্মে পরিবর্তিত মানুষের আত্মিক তেজে। প্রয়োজনে স্থানে স্থানে তাঁর প্রাণের ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণেরও কিছু কিছু কথার সমালোচনা করলেন। অথচ তিনি যেভাবে শ্রীরামকৃষ্ণকে অনুসরণ করে চলতেন তা ভাবা যায় না। ব্যষ্টির সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণের ন্যায় তিনিও জগন্নাথের আট্‌কে প্রসাদ না খেয়ে ভাত খেতেন না। একবার আট্‌কে ফুরিয়ে গেল। ওনার খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল। শুনে রাতারাতি রঘুবাবু পুরী গিয়ে আট্‌কে এনে দিলেন, তবে উনি অন্ন মুখে দিলেন।

---

*তিনি দেখলেন, পাঁচজন বিচারকের ডিভিসন বেঞ্চ বসেছে। উনি আবেদন করেছেন যাতে ওনাকে আজ্ঞা দেওয়া না হয়। কিন্তু ওনার আবেদন অগ্রাহ্য করে বিচারকরা, সর্বসম্মতভাবে রায় দিলেন যে ওনাকে 'আজ্ঞা' দেওয়া হোক। পরে বললেন, "তুমি রামদাস হবে।" রামদাস (হনুমান) অর্থাৎ অমর হলেন। সর্বজনীন ও সর্বকালীন হয়ে একত্বের ধর্ম প্রতিষ্ঠা ও প্রতিপালন করার দায়িত্ব পেলেন।

পুরীতে প্রায় এক বছর কাটালেন কিন্তু একদিনের জন্যও তিনি জগন্নাথ মন্দিরে যান নি। লক্ষ্য করলেন, মন্দিরে গিয়ে মানুষ বিভ্রান্ত হয়, একমাত্র দেহ মন্দিরেই শ্রীভগবান প্রকাশপান— এই সত্য আঁকড়ে ধরতে পারে না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য শ্রীজীবনকৃষ্ণ পথে বেরোলে পথের দু'ধারে যত মন্দির মসজিদ গীর্জা পড়ত, সমস্ত দেবালয়ের দেবতার উদ্দেশ্যে দূর থেকেই প্রণাম জানাতেন। কিন্তু ১৯৫৮ সালের ৪ঠা জুনের পর থেকে আর তা করতেন না।

এক অনুরাগীকে বললেন, দ্যাখ, এখন আমার অবস্থা বদলে গেছে। গভীর রাতে সকলে যখন ঘুমে অচেতন, আমার পোড়া চোখে ঘুম নেই। তখন রন্তিদেবের কথা মনে পড়ে। তিনি প্রার্থনা করছেন, জগতের সকল মানুষের মুক্তি না হলে তিনি মুক্তি চান না। আর বুদ্ধদেবের কথা— তিনি ধ্যানে বসার আগে জগতের সকল প্রাণীর আশীর্বাদ ভিক্ষা করতেন, যাতে তার মুক্তি হয়, অর্থাৎ তিনি বোঝাতে চাইছেন যে গোটা জগৎ যদি আশীর্বাদ করে তবে একজনের এই বিদ্যা লাভ হয়। সমস্ত বিশ্বসংসার আমায় আশীর্বাদ করেছিল তাই আমার এত হয়েছে। কেন জানিস? বিশ্বসংসার এক হবে, এই জীবনকৃষ্ণে পরিবর্তিত হবে তাই।

পুরীর রোজকার নির্ঘণ্টটি ছিল এই রূপ— রাতের আঁধার তখনও কাটেনি। শান্ত সমাহিত প্রকৃতি। দূর থেকে ভেসে আসছে সমুদ্রের ঢেউয়ে ঢেউয়ে সংঘাতের ঐক্যতানিক আওয়াজ। ওঁর জড়িত মধুর কণ্ঠের ধ্বনি— শান্তিঃ, শান্তিঃ, শান্তিঃ, ভগবান, ভগবান, ভগবান— শুনে সঙ্গীসাথীদের নিদ্রাভঙ্গ হোত। সমস্বরে প্রার্থনা শেষে ওনার জিজ্ঞাসা— কোন স্বপ্ন দেখেছিস বাবা? স্বপ্নালোচনার পর ভ্রমণ। নিত্যনূতন পথে। একই পথে পরপর দু'দিন হাঁটতেন না। ফিরে এসে পাঠ। ১১টায় স্নান আহার। ১টা থেকে আবার কথামৃত পাঠ— কিছুক্ষণ ধ্যান— সাড়ে চারটের পর আবার বেরোন সান্ধ্যভ্রমণে, ফেরার পথে সাগরপারের বালুকাবেলায় বসে ধ্যান। বাড়ী ফিরে আবার পাঠ রাত্রি ন'টা পর্যন্ত। তারপর খেয়ে দেয়ে শয্যাগ্রহণ।

কদমতলা ছেড়ে যখনই শ্রীজীবনকৃষ্ণ বাইরে থেকেছেন তখন মানুষ

শ্রীজীবনকৃষ্ণের দরদী মনের পরিচয়টি বেশী করে ধরা পড়েছে তাঁর সঙ্গ লাভধন্য ব্যক্তিদের কাছে। একবার পুরীতে রামকৃষ্ণবাবু ও আনন্দবাবু দুজনে ওনার কাছে আছেন। এক রাত্রে ওনার জল তেষ্টা পেয়েছে। কাউকে না ডেকে নিজেই বিছানা থেকে উঠে জল গড়িয়ে নিচ্ছেন। শব্দ হয়েছে। অমনি রামকৃষ্ণবাবু— কে? কে? বলে চেঁচিয়ে উঠেছেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ ব্যথাভরা কণ্ঠে অতি সংকোচের সঙ্গে বলে উঠলেন, কিছু মনে করিস নি বাবা, তোদের ঘুম ভাঙিয়ে দিলাম। কিছু মনে করিস নি। তাঁকে সংকোচ করতে দেখে রামকৃষ্ণবাবু মনে মনে খুব লজ্জিত ও বিস্মিত হলেন।

একদিন হাওড়া থেকে এক অনুরাগী (সুশীলবাবু) এলেন। সকালে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গে কথাবার্তা বলে এক আশ্রমে গেলেন দেখা সাক্ষাৎ করতে। বলে গেলেন আধঘণ্টার মধ্যে আবার ফিরে আসবেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার অপেক্ষায় বসে আছেন। ক্রমে বেলা হল। ওনার খাবার সময় হল। উনি এগারোটায় খান। দেরী পছন্দ করেন না। আনন্দবাবু স্নান করতে অনুরোধ করায় বললেন, ভদ্রলোক আসবেন বলেছেন তাই কেমন করে উঠি আর চান করি? আরও আধঘণ্টা পর তাকে অনুরোধ করায় বললেন, আজ আর চান করব না, খাবও না, তোরা খেয়ে নে। এই কথা নড়চড় হবার নয় বুঝে আনন্দবাবু ও রামকৃষ্ণবাবু মর্মাহত হলেন। ওনার ভালবাসার গভীরতার তল পাওয়া যায় না।

নবদ্বীপের সিংহরায় মশায় চিঠি দিয়েছেন, তার শরীর ভাল নেই তবু শ্রীজীবনকৃষ্ণের সঙ্গলাভের উদ্দেশ্যে পুরী আসছেন। শুনে উনি গজ্ গজ্ করতে লাগলেন, বললেন, এই বুড়ো বয়সে ধম্মোবাই উঠেছে ... ইত্যাদি। কিন্তু যখন বৃদ্ধ সিংহরায়মশায় এসে হাজির হলেন তখন ছুটে গিয়ে রাস্তাতেই তাকে জড়িয়ে ধরে কী আপ্যায়ণ! নিজেই বেরোলেন কাছে পিঠে একটা ভাড়াবাড়ির ব্যবস্থা করার জন্য। পরদিন সকাল থেকে বারান্দায় বসে রইলেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে, কখন দুধওয়ালা পেরোবে তাকে ধরে উনি যে ক'দিন থাকবেন সেই ক'দিনের জন্য দুধের রোজ করে দিতে হবে যে।

ভোর থাকতে উঠে কোন কোনদিন উনি ভাবে বিভোর হয়ে গাইতেন— (১) আরে মোর গোরা দ্বিজমনি, (২) গৌর প্রেমের ঢেউ লেগেছে গায় ... ইত্যাদি অনেকক্ষণ ধরে গাইতেন আর সমস্ত শরীর একেবারে মথিত হোত। উর্ধ্বদৃষ্টি, মাঝে মাঝে উরুর উপর ডান হাতের চাপড় দিতেন। গান সমাপ্ত হলে প্রার্থনা শুরু করতেন— ভগবান, ভগবান, ভগবান ...। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ১৯৫০-৫১ সালে মাঝে মাঝে মধুর রসের গানও হত তাঁর ঘরে। তখন রসের সাধন পর্যায় চলছিল। নিমাই নামে এক ভক্ত প্রায়ই বিদ্যাপতির পদাবলী গেয়ে শোনাত—

মাধব হাম কি করলু অপরাধ
যত ব্রজজন মধুপুর যাওত, তোঁহারি গুনগান শতমুখে গাওত
মঝু মরম দুঃখ কোই না শুধায়ত সবজন দেই অপবাদ। ...

শ্রীজীবনকৃষ্ণও সঙ্গে সঙ্গে গাইতেন আর মহাভাবে ভাবিত হয়ে, 'আঃ আঃ' উচ্চারণ করতে করতে অশ্রুবিহীন* অর্ধ্বনিমিলীত নেত্রে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতেন। কীর্তন শেষ হলে বলতেন, মনুষ্যজীবন পেয়ে যে এই মধুর রসের আস্বাদন করতে পারল না তার জীবন বৃথা।

কখনও বা বন্ধুবর হরেনবাবু গাইতেন চণ্ডীদাসের গান—

যদি গোকুলচন্দ্র ব্রজে নাহি এল
আমার এ হেন জীবন এ হেন যৌবন
গরল সমান ভেল।

(কানু বিনা জীবন আমার বিফলে গেল, কোন কাজে লাগল না গো)।

গান শুনে শ্রীজীবনকৃষ্ণের দেহমন্দির বিরহবিধূর মহাভাবে হিল্লোলিত হয়ে উঠত। ভাবে গর্গর মাতোয়ারা গোরাচাঁদের নবীন সংস্করণ দেখে ভক্তের দল বিস্মিত হোত।

---

*শ্রীমতীকে সখীরা বলছে, তোর চক্ষে জল নেই কেন? শ্রীমতী বলল, চক্ষের জল বিরহানলে বাষ্প হয়ে উপরে উঠে গেছে।

১৯৫২ সালের নভেম্বরে অবতারত্ব অতিক্রমের অনুভূতি* হওয়ার পর আর মধুর রসের গান তাঁর ঘরে বিশেষ হত না। ১৯৫৪ থেকে ৫৭, বছর তিনেকের কিছু অধিক সময় তাঁর ঘরে প্রতি শনিবার রামনাম গান হত। ১৯৫৭ সালের প্রথম দিকে তাও বন্ধ করে দেন। পরবর্তীকালে মাঝে মধ্যে আপনমনে, কখনও বা ভক্ত সঙ্গে সমবেতভাবে রামকৃষ্ণ বন্দনায় তাঁকে বিভোর হতে দেখা গেছে।

অবশেষে শ্রীজীবনকৃষ্ণের পুরীধামে অবস্থানের দিন শেষ হয়ে এল। উনি দেখলেন, রঘুনাথবাবু এই এক বছরে প্রায় ১২-১৩ বার কলকাতা থেকে পুরীধামে এসেছে তাঁকে দেখাশোনা করার জন্য। এত পরিশ্রমে ও অসুস্থ হয়ে পড়ছে। কিন্তু তিনি কদমতলার ঘরে ফিরতে চাইছেন না। তখন ঠিক হল শ্রীরামপুরে রবি গাঙ্গুলীর বাড়ী খালি আছে তারই দোতলায় তিনি থাকবেন। সেখানে একটি মেসের মত করা হল। রাত্রি ৯টা পর্যন্ত পাঠ ও ধ্যান চলত। তারপর আহারাদি সেরে ঢালাও বিছানায় শোয়া। শ্রীজীবনকৃষ্ণ পাশের ঘরে থাকতেন। পরদিন অতি ভোরে তাঁর কণ্ঠে ভগবান, ভগবান, ভগবান ... শান্তি, শান্তি, শান্তি, শোনামাত্র সকলে শয্যাত্যাগ করে ওনার ঘরে উপস্থিত হতেন। ভক্তদের অফিস আছে তাই ট্রেন ধরার জন্য তাড়াতাড়ি তারা আহারে বসলে, গরম ভাত ডাল ও তরকারী নিয়ে বিব্রত হতেন। তখন স্বয়ং শ্রীজীবনকৃষ্ণ ছুটে আসতেন, হাত পাখা নিয়ে বাতাস করতেন— আরও ভাত ও তরকারী নেবার জন্য পীড়াপীড়ি করতেন। ... তিনিই মাতা, তিনিই পিতা, তিনিই সখা ...।

একদিন বিকালে ওনার প্রচণ্ড পেটে যন্ত্রণা শুরু হয়েছে। যন্ত্রণায় মুখ কালি হয়ে গেছে। কিন্তু যতক্ষণ ভক্তেরা ছিল ততক্ষণ কিছু প্রকাশ করেন নি। সভা ভঙ্গ হলে ডাক্তার ডাকতে বললেন। সকলে ব্যস্ত হয়ে পড়বে বলে এতক্ষণ কিছু বলেননি। ডাক্তার এসে দেখে গিয়ে ওষুধ দেওয়ায় যন্ত্রণার উপশম হল। কয়েকদিন পর তাঁর সেদিনের অসুস্থতার সংবাদ পেয়ে মানিকবাবু এসে তাঁকে কদমতলায় ফিরে যাবার জন্য পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। তিনিও সেদিন এক বিশেষ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে মেস ভেঙ্গে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাই অনিচ্ছাসত্বেও কদমতলায় ফিরে এলেন।

*একটা উঁচু বারান্দায় শ্রীজীবনকৃষ্ণ আছেন। পাশে রাস্তা। নীচের ঐ রাস্তায় মানুষরতন (অবতার) মাথা নীচু করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর কোন কথা না বলে ঐভাবেই গুটি গুটি পায়ে চলে গেলেন।

১৯৬৪ সালের ২০শে মে কলকাতার বৌবাজারে গীতাভবনে ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থ পাঠের আমন্ত্রণ এল। শুরু হল নতুন এক পর্ব। যেখানে যেখানে এই বই পাঠ ও আলোচনা হতে লাগল সেখানকার অনেক মানুষও স্বপ্নে, ধ্যানে, এমনকি জাগ্রত অবস্থায় গ্রন্থরচয়িতার দর্শন পেতে লাগলেন। নানান আত্মিক দর্শন অনুভূতির মধ্য দিয়ে গ্রন্থের বিষয়বস্তুও উপলব্ধি করতে লাগলেন, সাথে সাথে তাদের আধ্যাত্মিক জীবন সমৃদ্ধ হতে লাগল। ধর্মজগতের ইতিহাসে এ এক অভিনব ঘটনা।

নিত্য যারা তার ঘরে এসে অনুশীলনে যোগ দিত তাদের প্রায় সকলকেই পাঠ করতে পাঠিয়ে দিলেন বিভিন্ন স্থানে। পাঠচক্র এক আন্দোলনের রূপ নিল। সবচেয়ে আশ্চর্য, পাঠকদের মধ্যে এমন কেউ কেউ ছিলেন যারা নিরক্ষর বা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গণ্ডী পেরোয়নি। অথচ দিনের পর দিন ব্রহ্মবিদ্যার মূর্তরূপ শ্রীজীবনকৃষ্ণের পদতলে বসে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলনের মাধ্যমে তারা যে ব্রহ্মবিদ হয়ে উঠেছেন তথা পরশমণির ছোঁয়ায় সোনা হয়ে গেছেন তার প্রমাণ ফুটে উঠতে লাগল এবার। তাদের মুখে ব্রহ্মবিদ্যার কথা শুনে মুগ্ধ হন সকল স্তরের মানুষ, শ্রোতাদের অন্তরাত্মা জেগে উঠতে থাকে প্রধানত দেবস্বপ্নে মানবব্রহ্ম শ্রীজীবনকৃষ্ণের চিন্ময়রূপ ধরে।

এই পাঠচক্রগুলিতে নিয়মিত পাঠক পাঠাবার ব্যবস্থা করার তথা পরিচালনার দায়িত্ব দিলেন সুশীল বন্দ্যোপাধ্যায়কে। পাঠচক্রের মাধ্যমে ব্রহ্মবিদ্যার অনুশীলন ও ব্রহ্মত্বদানের আয়োজন কদমতলার ঘর থেকে ছড়িয়ে পড়ল সর্বত্র। শ্রীজীবনকৃষ্ণের শারীরিক ধকল কমল। পাঠকদের এগিয়ে দিলেন মানুষের সামনে। অন্তরাল থেকে চৈতন্যস্বরূপে জেগে উঠতে থাকলেন শ্রোতাদের অন্তরে।

ঘাটশিলায় থাকাকালীন (১৯৬৫, ৩০শে অক্টোবর) তিনি সুশীলবাবুকে এক চিঠিতে লিখেছিলেন—

"প্রিয় সুহৃদ,

জয় নিতাই, জয় গৌর— বৈষ্ণবেরা আগেই নিত্যানন্দকে স্থান দেয়— নিতাই ভারী দয়াল— নিতাই প্রচার করেছিল। তাই নিত্যানন্দের স্থান প্রথম, গৌরাঙ্গের স্থান পরে। ...

এ জগতে মানুষ কখনও ব্রহ্মত্ব দান করেনি। তারা আম খেয়ে মুখ পুঁছে চলে গেছে আর আপনারা আম খাচ্ছেন আর জগতের মনুষ্যজাতিকে জোর করে খাওয়াচ্ছেন। কৃতাঞ্জলিপুটে মনুষ্যজাতির দ্বারে দণ্ডায়মান আর জোর করে তাদের ব্রহ্মত্ব দান করছেন— আর তারা কৃতজ্ঞচিত্তে সেই দানের কথা স্বীকার করছে। আপনি, জিতু, ভোলা, হীরু, প্রকাশ, খগেন, রবি, জয়দেব, সন্তোষ, গোপাল, বঙ্কিমবাবু ইত্যাদি আর আর সকলকে বলবেন আশীর্বাদ করতে আমাকে, যেন আমার এই ব্রহ্মত্ব মনুষ্যজাতির সকলে সমানভাবে পায়।..."

বাস্তবিক বহু নিতাই তথা পাঠকবৃন্দ বিভিন্নস্থানে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকথামৃত ও 'ধর্ম ও অনুভূতি' পাঠে একত্বের অনুশীলনে মত্ত হলে শিশুবৃদ্ধ, নরনারী, ধনী-নির্ধন, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, হিন্দু-মুসলমান, সকলের মধ্যে সমানভাবে তাঁর ব্রহ্মত্বের আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগল।

১৯৬৫ সালের ডিসেম্বরে ইংরাজী বইটি (Religion and Realisation)প্রকাশ হলে তা দেশ বিদেশে পাঠানো হল। আমেরিকা, ফ্রান্স, জার্মানী ও আরও অনেক দেশের বিশিষ্ট দার্শনিকরা এই বই পড়ে মুগ্ধ হয়ে চিঠি লিখেছিলেন। বইটিকে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের এম. এ. (M.A.) ক্লাসের রেফারেন্স বই হিসাবে গণ্য করা হল।

শ্রীজীবনকৃষ্ণের হজমের গোলমাল ও অর্শরোগের প্রকোপ বেড়ে গেল। জলবায়ুর পরিবর্তনের অভিপ্রায়ে কিছুদিনের জন্য ঘাটশিলা যাওয়া মনস্থ করলেন। যাবার সময় পথে ট্রেনেও অবিশ্রান্ত ব্রহ্মবিদ্যা প্রসঙ্গে আলোচনা

করেই যাচ্ছেন। মুখুজ্জে মশাই এক সময় শুচিতা প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুললে উনি বললেন— আপনাদের শাস্ত্রে আছে পুজো আহ্নিকের আগে জল গণ্ডুষ করে উচ্চারণ করতে হয়— অন্তর বাহির শুচি (স বাহ্য অভ্যন্তরং শুচি)— কেমন না? কিন্তু দেখুন, বাহির শুচি হলেই যে অন্তর শুচি হবে তার কোন মানে নেই— তা হয় না। আবার যার অন্তরে শুচিতা বিদ্যমান তার বাহির শুচির প্রশ্ন ওঠে না। এর প্রমাণ? দক্ষিণেশ্বরের ভবতারিনীর আরতি করছেন ঠাকুর কিন্তু নিঃসাড়ে মল নির্গত হয়ে তার কাপড়ে মাখামাখি। শুচিতার প্রয়োজন স্বাস্থ্যবিধির জন্য আত্মিকের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই।

শ্রীদ্বিজেন রায় ঘাটশিলায় থাকতেন। তিনিই ওখানে থাকার সব ব্যবস্থা করেছিলেন। তাঁর বাড়ীতে একটি আদিবাসী মেয়ে, নাম রাধি, কাজ করত। সে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে আগেই স্বপ্ন দেখেছিল সাপুড়ে রূপে। সাপুড়ে ঝাঁপি খুলতেই একটা বিষাক্ত সাপ বেরিয়ে এসে ওকে তাড়া করেছিল। ও খুব ভয় পেয়েছিল। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখেই চিনতে পেরে বলে উঠেছিল, এই তো সেই স্বপ্নে দেখা সাপুড়ে!

একজন মুসলমান কসাই শ্রীজীবনকৃষ্ণের ঘাটশিলা আসার ক'দিন আগে দ্বিজেনবাবুকে বলেছিলেন, 'আচ্ছা বাবু দেখিয়ে হাম স্বপ্নোমে দেখা আপকা সাথ এক ফকির হ্যায়। উসকো দেখনেসে মালুম হোতা হ্যায় উহ্ আল্লা হ্যায়।' উনি কথাটা উড়িয়ে দিলেন। তারপর শ্রীজীবনকৃষ্ণ ঘাটশিলা এসে মাস দুয়েক পর ফিরে গেছেন। একদিন ওর দোকানের পাশ দিয়ে দ্বিজেনবাবু যাচ্ছেন, হঠাৎ সেই কসাই ছুটে এসে ওনার পায়ে হাত দিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলল, 'হাম আপকো বোলা, উহ্ আল্লা হ্যায়।' তারপর হাউহাউ করে কান্না।

আশ্চর্য। সে একজন কসাই, রোজ খাসি কাটে, তাতেও আটকাল না।

এর অনেক পরে একদিন ওর ছেলে এসে ছলছল চোখে দ্বিজেনবাবুকে বলল,বাবু আমার বাবা মারা গেছেন। যাবার সময় দু-তিনবার শুধু এই কথাই বলে গেছেন, উহ্ ফকির আ গিয়া, উহ্ ফকির আ গিয়া।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ শুনে বলেছিলেন, হ্যাঁ, আমাকে যে একবারও অন্তরে

দেখবে, মৃত্যুকালে সে আমার দর্শন পাবে, তার মৃত্যুযন্ত্রণা আনন্দে রূপান্তরিত হবে। পরবর্তীকালে একথার সত্যতার প্রমাণ মিলেছে বহু মানুষের জীবনে। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে তাঁকে দর্শনের কথা তারা ঘোষণা করেছেন ও করছেন। 'মরণক্ষণে তোমায় দিব তোমারই নাম বঁধূ'— এই আর্তি তাদের জীবনে বাস্তবে রূপায়িত হয়েছে ও হয়ে চলেছে।

কয়েকটা দিন বেশ আনন্দে কাটল। বিকালের দিকে বেড়াতে বেরোতেন সুবর্ণরেখা নদীর তীরে, কখনও বাজারের দিকে কখনও বা ফুলডুংরি পাহাড়ে গিয়ে নির্জনে ধ্যানে বসতেন। এই সময় একদিন সুরেশবাবুর আগ্রহে পাঠ ও শ্রীজীবনকৃষ্ণের ব্যাখ্যা আলোচনার কিছু অংশ বিধৃত হল টেপ রেকর্ডে। এখানে এসে উপনিষদ ও ব্রহ্মসূত্রের নূতন নূতন ব্যাখ্যা দিতে লাগলেন। এ নিয়ে বই লেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। ফিরে এলেন কদমতলায়।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ একদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়েছেন। হঠাৎ ডাক শুনলেন, 'ও মশাই শুনুন, শুনুন। একটু দাঁড়ান।' দেখলেন, একটা নারকেল গাছের মাথায় একটা লোক তাঁকেই লক্ষ্য করে ডাকছে। গাছ থেকে দ্রুত নেমে এসে সে বলল, গত রাত্রে স্বপ্ন দেখছি, আপনি আমাকে বলছেন, তুই ওখানে পাঠ শুনতে যাবি, তারপর আপনার কদমতলার ঠিকানাও বলে দিলেন। উনি বললেন, তবে তাই যেও বাবা। ও কয়েকবার এসেওছিল।

১৯৬৬ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর মানিকবাবু কদমতলার ভাড়া বাড়ী ছেড়ে উঠে এলেন ব্যাতাইতলায়— নিজস্ব বাসভবনে। শ্রীজীবনকৃষ্ণ তার সাথে এলেন ব্যাতাইতলায়। এর কিছুদিন পরে গেলেন মধুপুর, স্বাস্থ্যোদ্ধারের উদ্দেশ্যে। কিন্তু শরীরের কোন উন্নতি হল না। মধুপুরে বসে তিনি লিখলেন Oneness নামে ছোট্ট কিন্তু মূল্যবান একটি লেখা। সেখানে বৈদিক সত্য তথা সনাতন ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করলেন শানিত যুক্তির সাহায্যে।

মধুপুরে উনি ছিলেন 'আনন্দ আশ্রম' নামে একটি বাড়ীতে। এই সময় একদিন হাওড়া থেকে একদল অনুরাগী ওনার সাথে দেখা করতে

গেলেন। ওদের দেখে, ওরে আমার চাঁদের হাট এসেছে রে— আমার চাঁদের হাট এসেছে রে— বলে কোথায় রাখবেন কী খাওয়াবেন তার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর ওনাদের ফেরার সময় হল। উনি যেন মুষড়ে পড়লেন। ওরা নিষেধ করা সত্ত্বেও ওদের সঙ্গে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লেন। যতক্ষণ দেখা যায়, গেটের সামনে রাস্তায় হাতজোড় করে দাঁড়িয়ে রইলেন। একটু পরে ওরা রাস্তার বাঁকে অদৃশ্য হলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণকে আর দেখা গেল না। সকলে মনে করলেন এবার উনি বাড়ী চলে গেছেন। আনন্দ আশ্রমের কাছে লেভেলক্রশিং পেরোবার সময় জানলা দিয়ে তাকিয়ে ওনারা দেখলেন, কী আশ্চর্য, উনি তখনও সেই স্থানে বদ্ধাঞ্জলি হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন আর একবার স্নেহধন্যদের দেখার আশায়।

১৯৬৭ সালের ১৯শে জানুয়ারী ইংল্যান্ডের শেফিল্ডে থিয়োসফিক্যাল সোসাইটিতে বক্তৃতা দেবার সুযোগ পেলেন শ্রীজীবনকৃষ্ণের কৃপাধন্য শ্রী সুব্রত ব্যানার্জী। 'এক ও একত্ব'— শিরোনামের এই বক্তৃতায় তার মুখে ধর্ম সম্বন্ধে নতুন কথা— একজন মানুষের সর্বজনীন হওয়া ও তাঁকে অন্তরে দর্শন করে মনুষ্যজাতির একত্ব লাভের কথা শুনে শোতৃমণ্ডলী হতবাক। প্রশ্নোত্তর পর্বের শেষে সকলে পরিতৃপ্ত। তখন এক বৃদ্ধা ইংরাজ মহিলা এগিয়ে এসে নিবেদন করলেন অত্যাশ্চর্য এক অনুভূতির কথা। তিনি খালিচোখেই দেখেছেন বক্তৃতারত সুব্রতবাবুর কপালে সেই পরম এক শ্রীজীবনকৃষ্ণের স্পষ্ট রূপ যার কথা-ই তিনি বলেছিলেন। ধর্মজগতের ইতিহাসে ধর্মের এমন জীবন্ত রূপ পরিগ্রহের কথা পূর্বে কখনও শোনা যায়নি।

এদিকে ওনার স্বাস্থ্যের আরও অবনতি ঘটল। নূতন ভক্ত সমাগমে বেশি কথা বলতে হয়, তাতে ওনার কষ্ট হবে ভেবে কয়েকজন ভক্ত ঠিক করলেন অন্য ভক্তদের এখন আসতে বারণ করে দেবেন। এই সময় একদিন তিনজন ভক্ত কিছুক্ষণ থেকে উঠে গেলেন, অমনি শৈলেনবাবু তাদের সঙ্গে উঠে বাইরে গিয়ে চুপি চুপি তাদের আসতে বারণ করে দিয়ে ফিরে এলেন। শ্রীজীবনকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করলেন, কী ব্যাপার রে? কী জন্য বাইরে গিয়েছিলি?

শৈলেনবাবু চুপ করে আছেন। কিন্তু ওনার কিছু বুঝতে বাকী থাকল না। ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, এরকম করলে তোদের কাউকে আসতে দেব না। কখনও কাউকে আসতে বারণ করবি না। পরক্ষণে আর্দ্রকণ্ঠে বললেন— ওরে এতে বৈষ্ণব অপরাধ হয় বাবা, ওরা যে ঠাকুরের কথা শুনতে আসে, ওতে আমার কোন কষ্ট হবে না বাবা।

তাঁর অসুস্থতা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। বেশ কিছুদিন থেকেই তিনি অর্শরোগে ভুগছিলেন। আগে পিঠে কার্বঙ্কল ঘা নিয়ে অনেকদিন ভুগেছিলেন। সারা শরীরে ঘামাচির মত হার্পিসের অসহ্য জ্বালা সহ্য করেছেন নীরবে। কিন্তু এবার হল ক্ষুদ্রান্ত্রে ক্যানসার। ভর্তি হলেন চিত্তরঞ্জন ক্যানসার হাসপাতালে। অস্ত্রোপচারের পর তার তলপেটের ডানদিকে ফুটো করে নল লাগানো হল। সেখান থেকে ফোঁটা ফোঁটা করে মল এসে জমা হত একটি প্লাস্টিক প্যাকেটে। এই অবস্থাতেও ঘরে সর্বক্ষণ পাঠ ও আলোচনা চালাতে লাগলেন। একদিন পাঠ চলতে চলতে প্যাকেট থেকে মল উপচে পড়ল। ঘর দুর্গন্ধে ভরে উঠল। তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হল বটে কিন্তু ওনার মন বিষাদে ভরে উঠল। অবস্থার আরও অবনতি ঘটল। একমাস পরে আবার ভর্তি করা হল হাসপাতালে সেখানেই তাঁর দেহাবসান ঘটে। দিনটি ছিল ১৩৭৪ সালের ২৬শে কার্তিক, ইংরাজী ১৯৬৭ সালের ১৩ই নভেম্বর।

প্রথমবার হাসপাতাল থেকে বাড়ী ফেরার দু'দিন আগে উনি বললেন, আর নয়, এবার পর্দা তুলে দে। মায়েদের কাছে আসতে দে। অনুরাগী অনেকের বাড়ীর মেয়েরা হাসপাতালে এসেছিলেন তাদের স্বপ্নদৃষ্ট পুরুষটিকে বাস্তবে মিলিয়ে নিতে। উনি বিছানায় বসে করজোড়ে আকুল হয়ে প্রার্থনা জানাতে লাগলেন এই বলে যে— 'মায়েরা আমাকে আর্শীবাদ করুন যেন ঠাকুর ঠাকুর করে যেতে পারি'। অবশ্য বাড়ী ফিরে গিয়ে আগের ব্যবস্থাই বহাল রেখেছিলেন।

হাসপাতালে অনুরাগীদের উদ্দেশ্যে বলছেন, কথামৃতে আছে ঠাকুর তার ভক্তদের বলছেন, তোমরা খুব করে সাধন কোরো। কিন্তু আমি তোদের

সাধন করতে বলছি না। তোরা আপনা হতে যে ব্রহ্মত্ব লাভ করেছিস তা জগতের মানুষকে বলবি— পাঠটা চালিয়ে যাবি। তোদের সাধনা এই পাঠ।

রঘুনাথবাবু দিনের পর দিন অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে হাসপাতালে শ্রীজীবনকৃষ্ণকে দেখাশোনা করতেন। একদিন একজন নার্স তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ঐ বৃদ্ধ মানুষটি আপনার কে হন? রঘুবাবু বললেন, উনি আমার বন্ধু। নার্সটি বলল, তাই আবার হয় নাকি? কিছুক্ষণ পর শ্রীজীবনকৃষ্ণ বেড়ে বসে হরলিক্স খাচ্ছেন, এই সময় কথা প্রসঙ্গে রঘুবাবু নার্সের সাথে তার কি কথা হয়েছিল তা জানালেন। শোনামাত্র ওনার সারা শরীর ঝাঁকুনী দিয়ে উঠে দুলতে লাগল। হাতে গ্লাসটি ধরা আছে আর উনি আবেগভরা কণ্ঠে বলতে লাগলেন, হ্যাঁ বাবা বন্ধুই তো। পরমবন্ধু। এমন বন্ধু আর পাবি না।

যে নার্স তাঁর সেবার সুযোগ পেয়েছিলেন তিনি আগে ওনাকে নমস্কার করে তারপর কাজ শুরু করতেন। একদিন আবার হঠাৎ হাতজোড় করে আদ্যাস্তোত্র বলতে লাগলেন। উনিও হাতজোড় করে থাকলেন। স্তব শেষে নার্সটি কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। উনি বললেন, একী করলি মা, তুই যে এই স্থানকে মন্দির বানিয়ে দিলি!

একবার ডাক্তারবাবু রঘুবাবুকে বললেন, দেখুন উনি সবসময় চিৎ হয়ে রয়েছেন। ওনাকে মাঝে মাঝে পাশ ফিরিয়ে দেবেন, কখনো কখনো উপুড় করে দেবেন। নাহলে বেড শোর (Bed sore) হয়ে যাবে। রঘুবাবু ওনাকে একথা বলতেই উনি চম্‌কে উঠলেন। উত্তেজিত হয়ে গর্জন করে বলে উঠলেন, কী বললি? জানিস, আমি জীবনে কখনও এক মুহূর্তের জন্যও উপুড় হইনি। ও আমি পারব না। রঘুবাবু তো একথা শুনে তাজ্জব হয়ে গেলেন। রক্তমাংসের মানুষের পক্ষে এ কী সম্ভব? পরে একদিন দ্বিজেনবাবুর কাছে গল্পচ্ছলে কথাগুলি বললেন। দ্বিজেনবাবু বললেন, তাই নাকি? একথা তো কাশ্মিরী শৈববাদে আছে। সেখানে বলা হয়েছে, শিব কখনও উপুড় হন না। তিনি 'চিৎস্বরূপ'। তাই শিবমূর্তি শায়িত থাকে, কখনও উপুড় হয়ে আছে এমনটা দেখা যায় না।

কেউ অসময়ে হাসপাতালে শ্রীজীবনকৃষ্ণের সাথে দেখা করতে গেলে লিফ্‌টম্যান আপত্তি করা দূরে থাকুক আগ্রহভরে তাকে পৌঁছে দিতেন ওনার কেবিনে। কথাপ্রসঙ্গে জানিয়েছিলেন তিনিও স্বপ্ন দেখে বুঝেছিলেন যে উনি একজন মহাপুরুষ। যে লব্ধপ্রতিষ্ঠ সার্জেন (ডা. অমিয় মজুমদার) ওনার অপারেশন করেছিলেন তিনিও দেহাবসানের পর কেঁদে ফেলেছিলেন। সমস্ত কাজ ফেলে রেখে পায়ে হেঁটে গিয়েছিলেন কালীঘাটের মহাশ্মশানে— শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে। অথচ এই ডাক্তার, নার্স বা লিফ্‌টম্যান কেউই তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন সম্বন্ধে আগে কিছুই শোনেন নি।

তাঁর দেহ যাবার পর মানিকবাবু এক স্বপ্নে দেখলেন, শ্রীজীবনকৃষ্ণ বলছেন, আমাকে কি ঋণী রাখতে চাস? আমার জন্য যে যা খরচ করেছে সমস্ত কড়ায় গণ্ডায় মিটিয়ে দিবি। শ্রীজীবনকৃষ্ণের অসুখের জন্য যে যা খরচ করেছে এমনকি শ্মশানে যে তাঁর জন্য একটা দেশলাই কাঠিও খরচ করেছে মানিকবাবু হাতজোড় করে তাকে তা ফিরিয়ে দিয়েছেন শ্রীজীবনকৃষ্ণেরই অবশিষ্ট সামান্য সঞ্চয় থেকে। তিনি শুধু দিতে এসেছেন নিতে নয়, তিনি যে পূর্ণ।

আদর্শ মানব শ্রীজীবনকৃষ্ণ মৃত্যুঞ্জয়। তাই তাঁর জীবনে 'দেহরক্ষা' শব্দের নূতন এক অর্থ পরিস্ফুট হল। তিনি তাঁর দেহটিকে, জৈবীরূপটিকে, রক্ষা করলেন অসংখ্য মানুষের দেহের ভিতর। তাই তাঁর স্থূল দেহাবসানের পরও তাঁকে অন্তরে দর্শনের ধারা অব্যাহত আছে। আবার নিত্য নূতন মানুষ অন্তরে তাঁর নবজন্ম প্রত্যক্ষ করায় তিনি যে শুধু সর্বজনীন নন সর্বকালীনও বটে তার প্রমাণ ফুটে উঠেছে। রবীন্দ্রনাথের 'মানুষের ধর্ম' গ্রন্থের ভূমিকায় কি এই মহামানবের কথাই আভাসিত হয়েছে যেখানে তিনি লিখছেন— ''আমাদের অন্তরে এমন কে আছেন যিনি মানব অথচ যিনি ব্যক্তিগত মানবকে অতিক্রম করে 'সদা জনানাং হৃদয়ে সন্নিবিষ্টঃ', তিনি সর্বজনীন সর্বকালীন মানব। সেই মানবের উপলব্ধিতেই মানুষ আপন জীবসীমা অতিক্রম করে মানব-সীমায় উত্তীর্ণ হয়। সেই মানবকেই মানুষ নানা নামে পূজা করেছে। সকল মানবের ঐক্যের মধ্যে নিজের বিচ্ছিন্নতাকে পেরিয়ে

তাঁকে পাবে আশা করে তাঁর উদ্দেশ্যে প্রার্থনা জানিয়েছেন— স দেবঃ স নো বুধ্যা শুভয়া সংযুনক্তু— সেই দেবতা, যিনি এক, তিনি আমাদের শুভবুদ্ধির দ্বারা এক করুন।''

বিশ্বমানব শ্রীজীবনকৃষ্ণের শুভ রূপ অন্তরে দর্শন করে সকল মানুষের আত্মিক একত্ববোধ জেগে উঠুক। মানুষ তার সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ সত্তার অনুধ্যানে মগ্ন হোক। পৃথিবী মধুমতী হয়ে উঠুক।

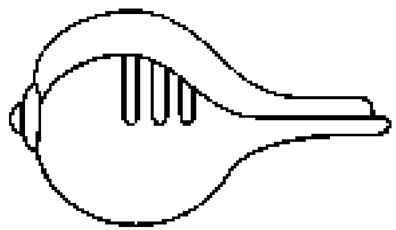

মানুষের ভিতরের অঙ্কট বঙ্কট পাপতাপ, কোন কিছুই আমার এই স্বতঃস্ফুরণকে ঠেকাতে পারবে না। — *শ্রীজীবনকৃষ্ণ*

The day is not far off when the world will be guided by spiritual power. — *Sri Jibankrishna*

একনজরে ব্যবহারিক জীবন

১। ১৮৯৩, ২০শে মে, শনিবার (১৩০০ বঙ্গাব্দ, ৭ই জ্যৈষ্ঠ) শুভ আবির্ভাব।

২। ১৯১৪, আই. এ. (I.A.) পাশ।

৩। ১৯১৭, নারিটে মহেশ ন্যায়রত্ন ইনস্টিটিউশনে শিক্ষকতার কাজে যোগ।

৪। ১৯১৮, শিক্ষকতা ছেড়ে মিলিটারী দপ্তরে কাজে যোগ ও সেই সূত্রে প্রথমে পারস্যে (ইরানে) পরে বেলুচিস্তানে (পাকিস্তানে) ও শেষে বসরা ও বাগদাদে (ইরাকে) বিভিন্ন কর্মে রত।

৫। ১৯২১, স্যানীটরী ইঞ্জিনিয়ারিং পড়তে বিলাত গমন।

৬। ১৯২২, স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও কলকাতা কর্পোরেশনে চাকরী গ্রহণ।

৭। ১৯২৬, কলকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেটে প্রকাশিত হল মহানগরীর স্যানিটেশন ব্যবস্থা সম্পর্কে ওনার লেখা দুটি প্রবন্ধ।

৮। ১৯২৩-২৯ পদাবলী, কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি লেখালেখি— সাহিত্যচর্চা।

৯। ১৯৪৩, বাড়ীতে কয়েকজন ভক্তসহ কথামৃত পাঠ শুরু।

১০। ১৯৪৯, চোখে চাল্‌সে ধরল ও চশমা নিতে হল (কয়েক মাসের জন্য)। যৌগিক ব্যাখ্যা লেখার আদেশ। লিখলেন ধর্ম ও অনুভূতি গ্রন্থ।

১১। ১৯৫৩, বেঙ্গল বোর্ডিং-এ কয়েকটা দিন।

১২। ১৯৫৩, ১৫ই জুন— চাকরী থেকে অবসর গ্রহণ।

১৩। ১৯৫৩, জুলাই ও আগষ্ট— মিডল্যাণ্ড হোটেলে।

১৪। ১৯৫৩, অক্টোবর— কালী ব্যানার্জী লেন থেকে উঠে এলেন কদমতলায় (৩২ নং কেদার দেউটি লেন)।

১৫। ১৯৫৬, মার্চ— আলপুকুরে অনুরাগীদের নিবিড় সাহচর্য দান।

১৬। ১৯৫৬, মে— ফটো তোলা হল।

১৭। ১৯৫৬, তাঁর ঘরে পল অ্যাডমের আগমন।

১৮। ১৯৫৬, ১লা অক্টোবর— বেনারস যাত্রা।

১৯। ১৯৫৭, অক্টোবর থেকে ১৯৫৮ জানুয়ারী— নিঃসঙ্গ জীবনযাপন।

২০। ১৯৫৮ জানুয়ারীর শেষ সপ্তাহে একবার ও ফেব্রুয়ারী-মার্চে— দ্বিতীয়বার আলপুকুরে ভক্তসঙ্গে।

২১। ১৯৫৮, ৩রা জুন— এশিয়াটিক কলেরায় আক্রান্ত।

২২। ১৯৫৯, মার্চ— রায়মশাই কর্তৃক আঙুল মচকানোর ঘটনা।

২৩। ১৯৬০, ২০শে সেপ্টেম্বর— Religion & Realisation-এর Foreward প্রকাশ।

২৪। ১৯৬১, হনলুলুর মেরোজী দম্পতির সাথে পত্রালাপ।

২৫। ১৯৬১, ২২শে জুলাই ও ২৩শে ডিসেম্বর— ধর্ম ও অনুভূতির যথাক্রমে ১ম ও ২য় ভাগ ছাপানো হল।

২৬। ১৯৬২, ৭ই সেপ্টেম্বর— পুরীগমন।

২৭। ১৯৬৩— পুরীতে বসেই ধর্ম ও অনুভূতির ৩য় ভাগ লিখলেন।

২৮। ১৯৬৩, ২৬ সেপ্টেম্বর— পুরী থেকে এসে উঠলেন শ্রীরামপুরে।

২৯। ১৯৬৪, ২০শে মে— বৌবাজারে গীতাভবনে ধর্ম ও অনুভূতি পাঠের মাধ্যমে পাঠচক্র আন্দোলনের শুরু।

৩০। ১৯৬৫, অক্টোবর— ঘাটশিলা গমন। কণ্ঠস্বর টেপরেকর্ডে গৃহীত হ'ল।

৩১। ১৯৬৫, ১লা ডিসেম্বর— Religion & Realisation বইটি ছাপানো হল।

৩২। ১৯৬৬, ২০শে সেপ্টেম্বর— কদমতলা থেকে ব্যাতাইতলার বাড়ীতে এসে উঠলেন।

৩৩। ১৯৬৬, ১লা অক্টোবর— মধুপুরে গমন। লিখলেন Oneness নামে একটি পুস্তিকা ও Oneness and Atombomb নামে একটি প্রবন্ধ।

৩৪। ১৯৬৭, ২৯শে জানুয়ারী— লন্ডনে সুব্রত ব্যানার্জী কর্তৃক শ্রীজীবনকৃষ্ণকে নিয়ে One and Oneness শিরোনামে বক্তৃতা প্রদান।

৩৫। ১৯৬৭, ১৩ই নভেম্বর— দেহরক্ষা।

এক নজরে আত্মিক জীবন

১। ১২ বছর ৪ মাস বয়সে (১৯০৫) সচ্চিদানন্দগুরু রূপে শ্রীরামকৃষ্ণকে দর্শন। বেদের সাধন শুরু।

২। ১৩ বছর ৮ মাস বয়সে (১৯০৭) স্বামী বিবেকানন্দকে দর্শন— রাজযোগ শিক্ষা।

৩। ১৫ বছর বয়সে ইষ্ট সাক্ষাৎকার (১৯০৯)।

৪। ২৪ বছর ৮ মাস বয়সে (১৯১৮) আত্মাসাক্ষাৎকার। বেদের সাধন শেষ ও বেদান্তের সাধন শুরু।

৫। ৩৭ বছর বয়সে (১৯৩০) বেদান্ত সাধন শেষ— নিগম শুরু।

৬। ১৯৩৩-৩৪— যৌগিক ব্যাখ্যা স্ফুরণের অনুভূতি।

৭। ১৯৪২— মানুষরতন দর্শন। অবতারত্ব লাভ।

৮। ১৯৪৩— ভাগবত কাহিনী অপরকে বলা শুরু— তাঁকে সচ্চিদানন্দগুরু রূপে দর্শন অনুভূতি শুরু।

৯। ১৯৫২, নভেম্বর— অবতারত্ব অতিক্রমের অনুভূতি, ভগবানত্ব লাভের ইঙ্গিত।

১০। ১৯৫৮, ৪ঠা জুন— ব্রহ্মত্বে অভিষেক— ভগবান ও পরমব্রহ্মরূপে তাঁকে অন্যদের দর্শন ও তাঁর স্বীকৃতি।

১১। ১৯৬১-৬২, ব্যষ্টির সাধন সম্পূর্ণ ও সমষ্টির সাধনে এক ও একত্বের ধর্মের প্রকাশ।

১২। ১৯৬৭, ১৩ই নভেম্বর— দেহরক্ষা— অমর জীবনের সূচনাকাল।

পরিশিষ্ট

কলিকাতা কর্পোরেশন রেলওয়ে বিভাগের প্রধান ও মুখ্য কর্ম্মচারী শ্রীযুক্ত জীবনকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয়ের অবসর গ্রহণকালে—

শ্রদ্ধাঞ্জলী

জীবনের পূর্বাপর দিক জন্মমৃত্যুর দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আবৃত। এসেছি কোথা থেকে— যাব কোথায়, জানি না। কবে যাব তা-ও অজানা। শুধু কি তাই? আহারাদি জৈব প্রক্রিয়ার আড়ালে যে অপরিসীম অভাব বোধ ও অতৃপ্তি প্রতি-নিয়ত কর্ম থেকে কর্মান্তরে আকর্ষণ করে, কামনা থেকে কামনায় প্রলুব্ধ করে— তাকে কি চিনি? কী চাই জীবনে? মানুষের জীবনে নাম, অর্থ, সম্পত্তি, প্রভাব— ভোগের শত লক্ষ উপায় ও উপকরণ। কী চাই, কতখানি চাই? মানব জীবনের উদ্দেশ্য কী? উত্তর দিয়েছেন ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণদেব— **'ঈশ্বর লাভই মানব জীবনের উদ্দেশ্য'**। অজ্ঞাত, অন্ধকার, পিচ্ছিল সংসারে কাম-কাঞ্চনের দুর্বার আকর্ষণ ছেড়ে ঠাকুরের ডাক শুনেছেন যাঁরা, যাঁরা ঈশ্বর লাভের উদ্দেশ্য জীবনে গ্রহণ করেছেন, খণ্ডিত জীবনে অখণ্ডের প্রতি, মৃত্যুশীল জীবনে অমৃততত্ত্বের প্রতি আকর্ষণ আছে যাদের— হে সাধক, তুমি তাঁদের অন্যতম। সিদ্ধি দুর্লভ, সাধনা দুরূহ— জানি সব, কিন্তু এ-ও জানি— সাধক স্থিরলক্ষ্য, অমিতশক্তি, দৃঢ়ভক্তি। 'যাতে তাঁর কৃপা হয়, ব্যাকুলতা হয় তার চেষ্টা কর, কৃপা হলে তাঁর দর্শন হবে। তিনি তোমাদের সঙ্গে কথা কইবেন'। ঠাকুরের অমোঘ অমৃতবাণী তোমার আধারে সার্থক হোক। হে সাধক-মুখ্য, তোমাকে নমস্কার।

যৌবন মানব হৃদয়ে বসন্তের মত বহু বিচিত্র রহস্যের অজানা সংকেত, বহু ভাবী ফলের পরিণতির ইঙ্গিত বহন করে, বহু বর্ণ গন্ধের ফুলসম্ভারে তা মনোরম হয়। এই যৌবনের উদ্দাম বেপরোয়া ক্ষণগুলির মধ্যে পুষ্পে কীট সম— নানা কদাচার, ব্যাভিচার, পাপ-বীজ অনুপ্রবিষ্ট হয়ে ভাবী জীবনকে নিশ্চিত অধঃপাতের দিকে ঠেলে দেয়। এ হেন যৌবনে কাম-কাঞ্চনের পীঠস্থানে, ভোগবিলাসের তীর্থভূমি ইয়োরোপের

বুকের উপর দাঁড়িয়েও নিজের জীবনে যে অপূর্ব আধ্যাত্মিক সহজ সুন্দর পরিমণ্ডল রচনা করেছ, তা আমাদের বিস্মিত করেছে, মুগ্ধ করেছে। ঠাকুর বলেছেন হোমাপাখীর কথা। ঠাকুর বলেছেন— **নিত্যসিদ্ধ, যেমন মৌমাছি, কেবল ফুলের উপর বসে মধুপান করে। নিত্যসিদ্ধ হরিরস পান করে— বিষয় রসের দিকে যায় না**। প্রায় শত বৎসর পরেও ঠাকুরের অমৃত বাণীর জীবন্ত তাৎপর্য আজ তোমার মধ্য দিয়ে আমরা স্পষ্ট অনুধাবন ও ধারণা করতে পেরে কৃতার্থ হয়েছি। হে নিত্যসিদ্ধ মহাপুরুষ তোমাকে নমস্কার, নমস্কার।

দুর্লভের লোভে, প্রতিষ্ঠার আশায়, ক্ষণিক উন্মাদনার বশে অনেকে বহুদান, মহৎকার্য ও আত্ম-বলিদান করেন। তাঁরা নমস্য। কিন্তু সাময়িক মূল্য তার যতই হোক সামগ্রিকতার দিক দিয়ে, চরিত্রের দিক দিয়ে তাদের সঞ্চয় সামান্য। প্রতি মুহূর্তে, তিল তিল সঞ্চয় করে ত্যাগে ও সত্যে বৃহৎকে ধারণ করতে, ভূমাকে বরণ করবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছে যে জীবন, তাকে প্রত্যক্ষ করবার বিরল ভাগ্য আমাদের— এই কর্মকেন্দ্রের বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মীদের হয়েছে। আমরা দিনের পর দিন তোমার সত্যনিষ্ঠা সত্যাচরণ লক্ষ্য করেছি, তোমার নির্মল বুদ্ধির দিব্যজ্যোতিতে স্নান করে ধন্য হয়েছি। সেই পূণ্যজ্যোতি আমাদের ভাবী জীবনের পথকে আলোকিত করুক। ঠাকুর বলেছেন— **যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশ্বরে গত হয়েছে তিনি সাধু। যিনি কামিনী কাঞ্চন ত্যাগী তিনিই সাধু। সাধু সর্বদা ঈশ্বর চিন্তা করেন, ঈশ্বরীয় কথা বই অন্য কথা কন না**। পরম পুরুষের এই অভ্রান্ত বাণী তোমার মধ্যে অচঞ্চল মহিমায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে— অপলক চোখে ঠাকুরের চিহ্নিত সাধুকে আমরা দিনের পর দিন তোমার মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি। হে সাধু তোমাকে নমস্কার, নমস্কার, নমস্কার।

বিনীত—

১৫/৬/১৯৫৩ **তোমার সহকর্ম্মীগণ**

পুরুষোত্তম

পরম কারণ পুরুষোত্তম ধ্যানমগ্ন যোগীবর
এ বিশ্ব নিখিল লীলা নিকেতনে রচিয়াছ খেলাঘর।
কে পারে বুঝিতে তোমার মহিমা,
অসীমের মাঝে টানিয়াছ সীমা,
সীমার মাঝারে অসীম হইয়া খেলিতেছ নিরন্তর।
সমভাবে কভু বিষম প্রকারে
লীলাময় তুমি হেরিছ তোমারে
অপরূপ তব রূপ সম্ভারে ভরে মম অন্তর।
আপনার লীলা হেরিছ আপনি
নিজ কণ্ঠহারে সাজাইছ মণি
আপনার রূপে মোহিত হইয়া হের নিজ কলেবর।
দেহে প্রাণে মনে রচি সিংহাসন
আছি অপেক্ষিয়া নহে অকারণ
দিন গণি শুধু— কবে হে আমারে করি লবে সহচর।

[শ্রীজীবনকৃষ্ণ রচিত এই গানটি মানিকবাবুর স্ত্রী শ্রীমতি আশালতা দেবীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।]

তীর্থযাত্রা

চলিয়াছি তব তীর্থ পানে
ধূলিতে ধূসর মোর পথ,
জানিনা তো সে কিসের টানে ...
চিহ্ন দেখি চলে গেছে রথ

এই পথে, অজানার দেশে—
যাত্রা নাকি সেথা শেষ হবে,
সকলে মিলিবে যেথা এসে,
পথ শুধু পিছে পড়ি রবে।

আমিও এ পথ বাহি চলি ...
রঙিন ধূলায় দেহ মন,
রাঙাইয়া খেলি শুধু হোলি
চারিদিকে হেরি প্রিয়জন!

পথ চলি আর করি খেলা
রথ রেখা দেখি মাঝে মাঝে
আসে আর চলি যায় বেলা ...
কোথা যাই তাও বুঝি না যে!

দূরে শুনি কার বাজে বাঁশী ...
কাছে— কভু দূরে সরি যায়—
মিলাইয়া যায় কাছে আসি
ধ্বনি শুনি আমার হিয়ায়!

তীর্থ আমি নাহি চাহি আর
পথ রেখা ধরি শুধু চলি ...
বাজুক বাঁশরী বারবার
ধুলি লয়ে খেলি শুধু হোলি!

১০.০৩.১৯৪৩

বাণী-সুধা

- মানুষের ভেতরে রয়েছে ভগবান, আর মানুষ সেকথা ভুলে ঘুরে বেড়াচ্ছে চারিদিকে— পুরী, রামেশ্বর, দ্বারকা, বদরিকা! কোথা ভগবান! কোথা ভগবান!
- যে দেশে বলেছে, শৃন্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রাঃ, যে দেশে বলেছে, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, যে দেশে বলেছে, অহং ব্রহ্মাস্মি, সেই দেশেতেই মানুষের জন্য কী বিধান দেওয়া হল? গোময় আর গোমূত্র খাওয়া!
- যোগ মানে পরিবর্তন, যুক্ত হওয়া নয়। জীব শিবে পরিবর্তিত হয়।
- বিশ্বাসকে প্রমাণ বলা আত্মপ্রবঞ্চনা— ধর্মে প্রমাণ আছে।
- ঈশ্বরের জন্য যে ব্যক্তি মুহূর্তে যে কোন কিছু ত্যাগ করতে প্রস্তুত তারই বিবেক লাভ হয়েছে।
- শরীরের আদিব্যাধির সংগে ব্রহ্মবিদ্যার কোন সম্পর্ক নেই। বহ্মবিদ্যা বিদ্যা মাত্র— সর্বসিদ্ধিদায়ী মাদুলী নয়।
- ব্রহ্মজ্ঞানের পর তত্ত্বজ্ঞানে যারা ফিরে আসেন তারা শিষ্য করতে পারেন না— যারা বুঝেছেন ঈশ্বরই কর্তা তারা শিষ্য করতে পারেন না। সচ্চিদানন্দগুরুর কৃপা যারা পেয়েছেন তারা আর শিষ্য করতে পারেন না।
- শুদ্ধমনে একমাত্র ব্রহ্মের চিন্তা জাগে। যখন মনে ব্রহ্মের চিন্তা জাগবে— বুঝবি মন শুদ্ধ হয়েছে।
- ধর্ম নীতিবাদ নয়— বোঝাবার বিষয়ও নয়। ধর্ম অনুভূতির জিনিস।
- দুঃখ হচ্ছে মানুষের অভাব। সেই অভাব মেটে যখন মানুষ ঈশ্বরত্ব লাভ করে।
- স্ব-স্বরূপকে ভুলে পঞ্চভূতে গঠিত দেহকেই আমি বলে ভাবাকে ভুতে পাওয়া বলে।

- আমি একজন মানুষ, কিন্তু সে নতুন মানুষ। নতুন মানুষ কী করে? নতুন যুগের সূচনা।
- আত্মা যদি কৃপা করে দেহ মধ্যে প্রকাশ হন— তবে প্রকাশ। তোমার লেকচারে দেহ থেকে আত্মা মুক্ত হবে না।
- জীবোদ্ধারের কথা শুনতে পারি না, আমার কষ্ট হয়। জীব কই? জীবতো দেখতে পেলুম না, সবই যে শিব।
- এই মানুষের প্রাণশক্তি বা কুণ্ডলিনী রাজযোগের মাধ্যমে সহস্রারে ব্রহ্মত্ব লাভ করে। আর হাজার হাজার নরনারী শিশুবৃদ্ধ তাঁকে তাদের অন্তরে দেখে সেই কথার প্রমাণ জগতে স্থাপন করে।
- কামিনী কাঞ্চন ত্যাগের অছিলা তুলে, সমস্ত মনুষ্যজাতিকে কি বিভ্রান্ত করেছে। আর কোন সুদূর অতীতকালে পিতা পুত্রকে বলছে তত্ত্বমসি। বারবার বলছে। তারপরে তার প্রমাণ দিচ্ছে কোথায়? বলছে কি, না— ত্বং স্ত্রী, ত্বং পুমানসি, ত্বং কুমার উত বা কুমারী, ত্বং জীর্ণোদণ্ডেন বঞ্চসি বেদের ঋষি কথিত সত্য— আমাকে জানিয়ে দিচ্ছে।
- যদি কারও এই ব্রহ্মত্ব লাভ না হয় সে আমারই অক্ষমতা। আমি তাদের দান করতে পারছি না। এ বিদ্যা দানের বস্তু।
- আত্মা যাকে বরণ করেন তারই হয়। কেন তিনি মাত্র একজনকে বরণ করেন? এর কারণ একজনের হলেই জগৎসুদ্ধ মনুষ্যজাতির হ'ল। একের একত্ব (ব্রহ্মত্ব) সকলের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লে বোঝা যায় একের হলেই সকলের হ'ল।
- Man becomes God. There is no other God any where else. I have this tale to tell the world.— *Sri Jibankrishna*
- মনুষ্যজীবনের উদ্দেশ্য ভগবান দর্শন নয়, মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য এই আত্মিক একত্ব লাভ।

Manuscript of Religion & Realisation

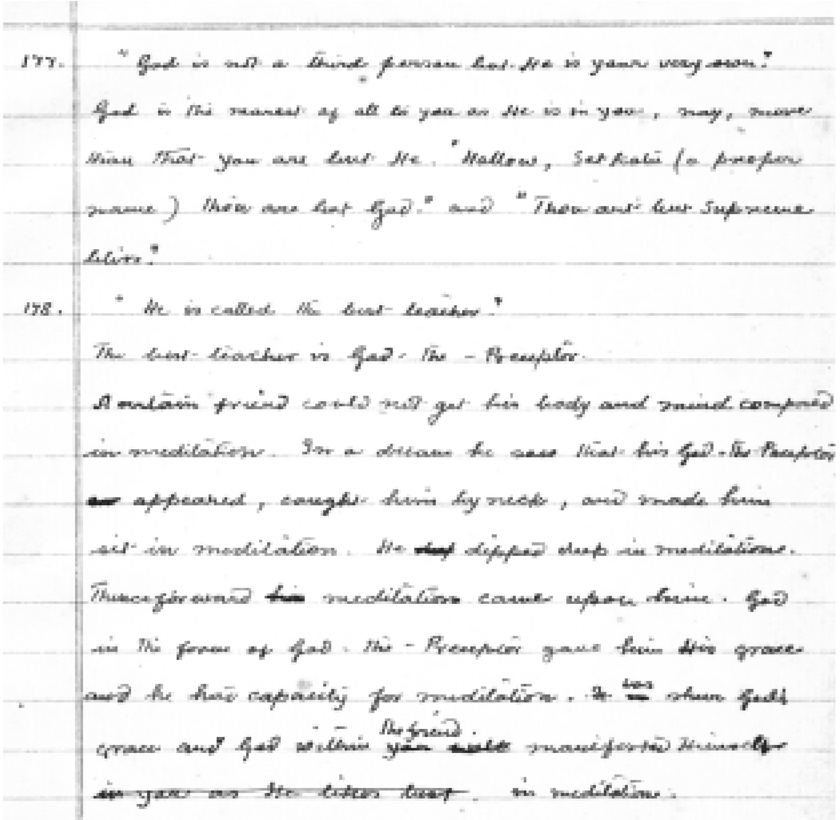

177. "God is not a third person but He is your very own."
God is the nearest of all to you as He is in you, nay, more than that you are but He. "Hallow, Sat Kali (a proper name) thou are but God." and "Thou art but Supreme Bliss."

178. "He is called the best teacher."
The best teacher is God-the-Preceptor.
A certain friend could not get his body and mind composed in meditation. In a dream he saw that his God-the-Preceptor appeared, caught him by neck, and made him sit in meditation. He dipped deep in meditation. Thenceforward meditation came upon him. God in the form of God-the-Preceptor gave him His grace and he has capacity for meditation. It was then God's grace and God within the friend manifested Himself in meditation.

ধর্ম ও অনুভূতির পাণ্ডুলিপি

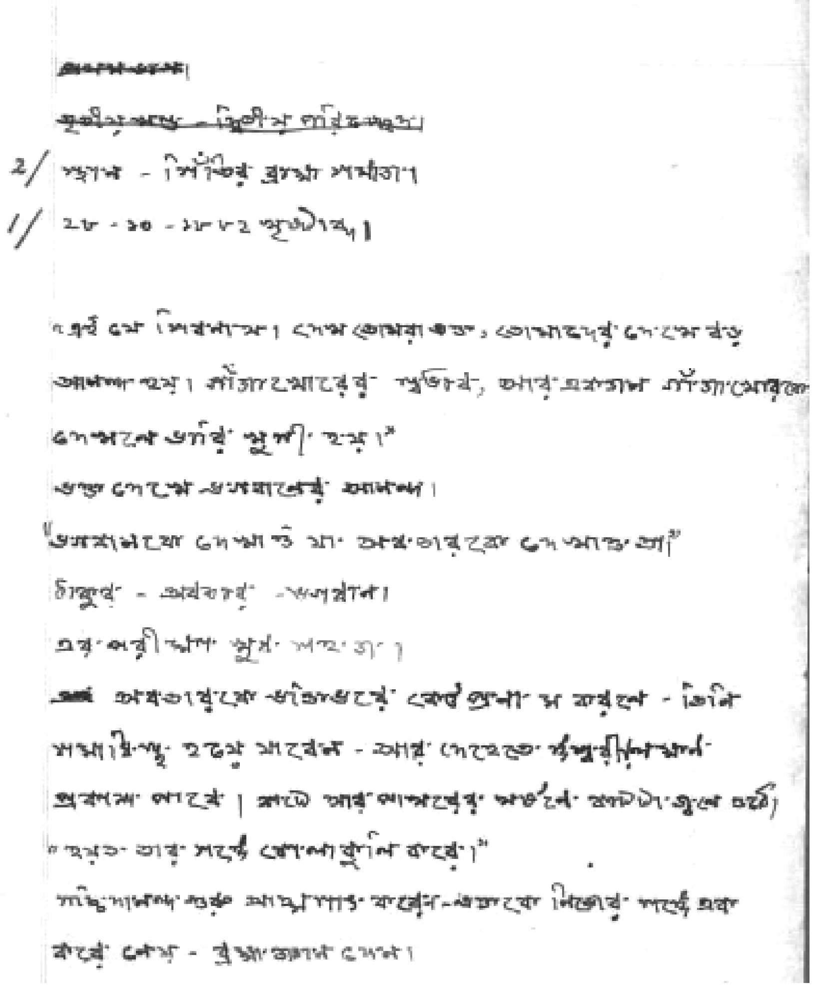

শ্রীজীবনকৃষ্ণ বিরচিত একটি পদাবলী

বঁধুয়া পরাণে তিয়াসা জাগে
নয়ন মেলিনু তোমারে পেখিনু
মরমে আঁকিনু ছবি।
হৃদয় দহিল মরম টুটিল
হেরিয়ে দুপুর রবি।।
কুসুম পরশে চাহিনু হরষে
মিলিল কণ্টক শুধু
(বঁধুয়া পরাণ কাঁদিছে রাগে)
চরণ ধরিব মরণ সাধিব
তখন বুঝিবে মনে
মরণ না হলে পিরীতি না হয়
পিরীতির ধারা ভণে।।

আমার জীবনের একমাত্র প্রার্থনা— বিশ্বের সমস্ত নর-নারী, শিশু-বৃদ্ধ সকলে আমার এই ব্রহ্মত্ব লাভ করুক।

শ্রীজীবনকৃষ্ণ